গঠনতন্ত্র

হেযবুত তওহীদ

মানবতার কল্যাণে নিবেদিত

বাসা নং- ০৩, রোড নং- ২০/এ, সেক্টর- ১৪, উত্তরা, ঢাকা।
ফোন- ০২-৫৮৯৫৩৬৩৩

গঠনতন্ত্র

হেযবুত তওহীদ

হেযবুত তওহীদ

Hezbut Tawheed

গঠনতন্ত্র

হেযবুত তওহীদ
বাসা নং- ৩, রোড নং- ২০/এ, সেক্টর-১৪, উত্তরা, ঢাকা
০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৯৩৩-৭৬৭৭২৫
০১৭৮২-১৮৮২৩৭

ওয়েবসাইট: www.hezbuttawheed.org
ইমেইল: hezbuttawheed1995@gmail.com

প্রকাশকাল: আগস্ট ২০১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ: জুলাই ২০১৮

ফেসবুক পেজ:
Hossain Mohammad Salim | facebook.com/emamht

ইউটিউব:
www.youtube.com/hezbuttawheed

সরাসরি ভিজিট করতে স্মার্ট ডিভাইস থেকে স্ক্যান করুন

মূল্য: ৫০.০০ টাকা

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৭

হেযবুত তওহীদ নবজাগরণ (রেনেসাঁ) সৃষ্টি করতে চায় ১৭

*হেযবুত তওহীদ (**Hezbut Tawheed**) এর সংঘ স্মারক* ২৯

ধারা-১) নাম: ২৯

ধারা-২) প্রতিষ্ঠাতা: ২৯

ধারা-৩) প্রতিষ্ঠাকাল ও স্থান: ২৯

ধারা-৪) এমাম: ২৯

ধারা-৫) প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা: ৩০

ধারা-৬) কার্যক্রমের আওতাভুক্ত এলাকা: ৩০

ধারা-৭) প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা: ৩০

ধারা-৮) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ৩০

ধারা-৯) মূলনীতি: ৩০

ধারা-১০) কর্মসূচি: (কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেখুন পরিশিষ্ট অংশে) ৩১

এই পাঁচ দফা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ থেকে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে- ৩১

ধারা-১১) প্রতীক: (প্রতীকের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেখুন পরিশিষ্ট অংশে) ৩২

ধারা-১২) আয়-ব্যয়: ৩৩

*হেযবুত তওহীদ (**Hezbut Tawheed**) এর গঠনতন্ত্র* ৩৬

ধারা-১৩) নাম: ৩৬

ধারা-১৪) গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা: ৩৬

ধারা-১৫) কার্যক্রমসমূহ: ৪১

ধারা-১৬) প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ: ৪১

ধারা-১৭) নারীদের অংশগ্রহণ: ৪২

সাংগঠনিক অধ্যায় ৪৩

ধারা-১৮) সদস্যস্তর ও আনুগত্য ধারার বৈশিষ্ট্য: ৪৩

ধারা-১৯) সদস্যপদ: ৪৪

ধারা-২০) শাখা স্থাপন: ৪৫

ধারা-২১) কমিটি গঠন: ৪৬

ধারা-২২) শাখা কমিটি বাতিল বা অনুমোদন প্রত্যাহার: ৪৬

ধারা-২৩) কেন্দ্রীয় কমিটির কাঠামো: ৪৬

ধারা-২৪) নির্বাচন/মনোনয়ন পদ্ধতি: ৬০

ধারা-২৫) শাখাভিত্তিক কমিটি গঠন: ৬১

ধারা-২৬) নেতৃত্বের অযোগ্যতা: ৬২

ধারা-২৭) উপদেষ্টা কমিটি: ৬২

ধারা-২৮) সভা: ৬২

ধারা-২৯) উপ-কমিটি: ৬৩

ধারা-৩০) আহ্বায়ক কমিটি: ৬৩

ধারা-৩১) শাখা কমিটি: ৬৩

ধারা-৩২) গঠনতন্ত্র সংশোধনী: ৬৩

পরিশিষ্ট ৬৪

কর্মসূচির ব্যাখ্যা (ধারা- ১০ থেকে): ৬৪

হেযবুত তওহীদের প্রতীকের ব্যাখ্যা (ধারা ১১ থেকে): ৬৯

ধারা ১৯: গ থেকে (১): সক্রিয় সদস্যের অঙ্গীকারনামা: ৭২

ধারা ১৯: গ থেকে (২): সদস্যদের অঙ্গীকারনামা: ৭৪

ধারা ১৯: গ থেকে (৩): কমিটির প্রধানদের অঙ্গীকারনামা: ৭৫

ধারা ১৯: গ থেকে (৪): উপদেষ্টাবর্গের সম্মতিপত্র: ৭৬

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ৭৭

হেযবুত তওহীদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি..৭৭

হেযবুত তওহীদ কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ও অন্যান্য ভিডিও সামগ্রী ৭৯

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

মুখবন্ধ

মানুষ আল্লাহ তা'আলার এক অসাধারণ সৃষ্টি। মানুষ শুধু দেহধারী প্রাণী নয়, তার একটি আত্মাও আছে। দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সে এক ভারসাম্যপূর্ণ সৃষ্টি। মানুষের ইহকাল যেমন রয়েছে তেমনি পরকালও রয়েছে। মানুষের ইহকালটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে সে যে কাজ করবে তারই পরিণতি সে পরকালে ভোগ করবে। এই কর্মফলকেই বলা হয় হাশর। কাজেই মানুষের প্রতিটি কর্ম হবে দুই জীবনকে ধারণায় রেখে। সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ 'কুন' (হয়ে যাও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, শুধু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিজ হাতে। মানুষকে আল্লাহর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে তাঁর নিজের রুহ প্রবিষ্ট করেছেন, ফলে মানুষই একমাত্র সৃষ্টি যা আল্লাহর পবিত্র রুহ নিজের সত্তায় ধারণ করে। এর অর্থ সে আল্লাহর গুণাবলী তথা সিফতগুলো ধারণ করছে। অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে সেবা করার জন্য। সুতরাং মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির মতো নয়। আরো অনেকগুলো কারণ বলা যাবে তবে মৌলিক এই ক'টি কারণই মানুষের অনন্যতা অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট। মানুষকে আল্লাহ দৃষ্টি দিয়েছেন যেন সে যেকোন কিছু চোখে দেখে যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করে। তাকে কান দিয়েছেন শ্রবণ করে সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য। অনন্য ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্ক দিয়েছেন চিন্তা করার জন্য, তাকে বিবেক দিয়েছেন ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত বোঝার জন্য। হৃদয় দিয়েছেন উপলব্ধি করার জন্য। সে উপলব্ধি করবে কোনো বিষয়ের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব, ব্যাপ্তি, উচ্চতা ইত্যাদি। কাজেই মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করতে পারে না। যেমন একটা পশু খায়, ঘুমায়, বংশ বৃদ্ধি করে, পরিণত বয়সে মাটির সঙ্গে মিশে যায়; তেমনি মানুষও খায়, ঘুমায়, বংশ বৃদ্ধি করে, পরিণত বয়সে মারা যায়। কিন্তু মানুষ এভাবে পশুর মতো জীবন পার করতে পারে না। মানুষের এই জীবনের উদ্দেশ্য রয়েছে, অর্থ রয়েছে। ঐ উদ্দেশ্য পূরণ হলেই তার জীবন সার্থক হবে। মানুষের জীবনকে সার্থক করতে হলে সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে।

তাকে ভাবতে হবে তার নিজেকে নিয়ে। সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় তার গন্তব্য, কী তার কর্তব্য? তাকে ভাবতে হবে তার পরিবারকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে। সমাজ তার দেহের ন্যায়। দেহে যেমন কোনো রোগবালাই বাসা বাঁধলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করে তেমনি সমাজের মধ্যেও যদি কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, অন্যায়, অশান্তি, অস্থিরতা দেখা দেয় সেটা সমাধান করার ক্ষেত্রেও প্রতিটি মানুষের কর্তব্য রয়েছে, কেননা ওগুলো তার জীবনের স্বাভাবিক গতিকেও বিঘ্নিত করবে। কাজেই তাকে সমাজ নিয়েও ভাবতে হবে। তাকে ভাবতে হবে দেশ নিয়ে, কেননা এই দেশের আলো-বাতাসে সে বেড়ে উঠেছে, এখানে সে পড়াশুনা শিখেছে, বড় হয়েছে, এখানে সে জীবিকা নির্বাহ করে বেঁচে আছে। দেশের প্রতি তার কর্তব্য রয়েছে। তাকে ভাবতে হবে পৃথিবীকে নিয়ে, কারণ আল্লাহ বলেছেন, এই পৃথিবীতে (ফিল আরদ) সে আল্লাহর খলিফা, প্রতিনিধি। কাজেই তাকে ভাবতে হবে পৃথিবীর পরিস্থিতি নিয়ে, পৃথিবীর মানুষকে নিয়ে। পৃথিবীর মানুষ শান্তিতে আছে, না অশান্তির মধ্যে আছে। কেন সে ভাববে? কারণ আল্লাহ বলেছেন সমগ্র মানুষ এক জাতিভুক্তই ছিল (সুরা ইউনুসঃ ১৯), তারা এক পিতা মাতার সন্তান (সুরা হুজরাত ১৩)। আল্লাহ বলেন, "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন" (সুরা নিসাঃ ০১)। কাজেই সৃষ্টিগতভাবে তারা ভাইবোন। তাই প্রতিটি মানুষকে মানবজাতিকে নিয়ে ভাবতে হবে।

এই মুহূর্তে আমরা বিশ্বের পরিস্থিতি কী দেখতে পাচ্ছি? পৃথিবীময় আজ অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, হানাহানি, দ্বন্দ্ব, জাতিতে জাতিতে চলছে সংঘাত। গত এক শতাব্দীতে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করে তের কোটি বনি আদম নিহত হয়েছে। আহত, বিকলাঙ্গ হয়েছে আরো বহুগুণ। বহু শহর নগর বন্দর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। কমপক্ষে পনের হাজার এটম বোমা তৈরি করে রাখা হয়েছে। এর একেকটি হিরোশিমা কিংবা নাগাসাকিতে ব্যবহৃত বোমার চেয়ে বহুগুণ প্রাণঘাতী ও ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন। পারমাণবিক বোমার বাইরে যে অসংখ্য বোমা মানুষ আবিষ্কার করেছে সেগুলোর বিধ্বংসী ক্ষমতাও বলতে গেলে অকল্পনীয়। এগুলো তৈরি করা হয়েছে কি উদ্দেশ্যে? নিশ্চয়ই বন্য পশু কিংবা ভিনগ্রহের কোনো কাল্পনিক প্রাণীকে মোকাবেলা করার জন্য নয়। বরং মানুষকে হত্যা করার জন্যই মানুষের এত আয়োজন। এই পৃথিবী নামক গ্রহটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া এবং এখানে বসবাসরত সমস্ত প্রাণের অস্তিত্ব বিনষ্ট করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। যেকোন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কিংবা কোনো

অপরিণামদর্শী শাসকের ইঙ্গিতে যেকোন মুহূর্তে এই বোমা তার ধ্বংসলীলা ঘটাতে পারে। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে চলছে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, শাসকের উপর শাসিতের জুলুম, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা, সরলের উপর ধূর্তের প্রতারণা। এই মুহূর্তে কোটি কোটি লোক গৃহহারা। এই হলো পৃথিবীর অবস্থা। আর প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি, দাঙ্গা, গুম, খুন, রাহাজানি, সুদ ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে চলছে। বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে মানুষ আজ দিশেহারা। মানুষের এই পরিণতি কেন। কারণ মানুষ একদিকে যেমন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত), অন্যদিকে সে নিজের কর্মদোষে সর্বনিকৃষ্ট জীবেও পর্যবসিত হতে পারে। আল্লাহ কোর'আনে একাধারে মানুষকে সৃষ্টির সেরা (খায়রুল বারিয়াহ) এবং সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট (শাররুল বারিয়াহ) বলে আখ্যায়িত করেছেন (সুরা বাইয়েনাহ ৬-৭)।

মানুষের জন্য এই সুন্দর পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা বাসযোগ্য করে বানিয়েছেন। যে যুগে মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে চূড়ান্ত অগ্রগতি করেছে সেই যুগে পৃথিবীটা মানুষের বাসযোগ্য নেই কেন? কেন আজকে এই পৃথিবীর বাতাস দূষিত, পানি দূষিত, মাটি দূষিত, কেন আজকে এই মানুষগুলো একজন আরেকজনের রক্ত শোষণ করার জন্য উন্মত্ত, কেন তারা একজন আরেকজনকে ধ্বংস করার জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে? কোথায় তারা পথ হারিয়েছে? কোথায় তারা ভুল করেছে? চিন্তাশীল মানুষ আজ দিশেহারা। সরকারগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ ব্যয় করে একেকটা নির্বাচনে যাচ্ছে, কিন্তু চরম অসৎ মানুষেরা নেতৃত্বে উঠে আসছে যারা প্রতিহিংসার রাজনীতি আর লুটতরাজ চালিয়ে দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে। অপরাধ দমনের জন্য কঠিন কঠিন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হচ্ছে, নতুন নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। জাতিসংঘ তৈরি হয়েছে, বড় বড় আন্তর্জাতিক সমিতি-সংঘ হচ্ছে যুদ্ধ রক্তপাত বন্ধ করার জন্য। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগের থেকে বর্তমানে মানুষের জীবনে অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, বঞ্চনা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেকোন সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এই সুন্দর পৃথিবী, একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে মুসলিম নামক সেই জাতিটিও যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল যাবতীয় অন্যায়, অশান্তি, যুদ্ধ, রক্তপাত থেকে মানুষকে মুক্ত করা। সে দায়িত্ব তারা বহু শতাব্দী আগেই পরিত্যাগ করেছে এবং পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছে। এখন যদি মানবজাতির সম্মিলিত কর্মফলের দরুন পারমাণবিক যুদ্ধে পৃথিবী তথা মানবজাতি ধ্বংসের মুখে উপনীত হয় তাহলে সেই উম্মাহর উপায় কী হবে? তাদের দুনিয়ার সাথে আখেরাতও ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বিষয়টি একটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

আল্লাহ প্রথম মানব আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ রসুল (সা.) পর্যন্ত যত নবী রসুল পাঠিয়েছেন সবাইকে মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি মূল মন্ত্র দান করেছেন। সেটা হলো - তাঁর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম না মানা অর্থাৎ স্রষ্টার নিঃশর্ত আনুগত্য করা, একমাত্র তারই এবাদত করা। অতীতের নবীগণ কোনো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গোত্রের জন্য এসেছেন, এমন কি একটি পরিবারের জন্যও একজন নবী এসেছেন। কিন্তু সর্বশেষ যিনি এসেছেন তিনি সমস্ত মানবজাতির জন্য আল্লাহর রসুল। তাঁর উপরে যে দীনটি আল্লাহ দিলেন তা পৃথিবীর সর্বত্র বসবাসকারী জনসম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য কারণ এটা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে রচিত অর্থাৎ দীনুল ফিতরাহ বা প্রাকৃতিক দীন। এই দীন দেওয়ার পর তিনি রসুলকে দায়িত্ব দিলেন সমস্ত পৃথিবীতে একে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। উদ্দেশ্য সমস্ত মানবজাতির জীবন থেকে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা। শেষ নবী (সা.) এই মহান লক্ষ্যকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে একটি জাতি তৈরি করলেন যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী। আল্লাহ এই জাতিকে মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন (সুরা ইমরান ১১০)। এই আয়াতের শেষাংশে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে- তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে আর অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত করবে। কিন্তু তারা আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্ব ত্যাগ করলে নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধাদানের এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে সেটা আখেরী নবী মোহাম্মদ (সা.) একটি উম্মাহ গঠন করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং মানবজাতির সামনে একটি নমুনা বা আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কীভাবে সমাজ থেকে মিথ্যা, অন্যায়, অশান্তি দূর করে সেখানে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। তিনি তাঁর হাতে গড়া উম্মাহকে সঙ্গে নিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম, জেহাদের মাধ্যমে তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে আল্লাহর দেওয়া জীবনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করলেন। পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত আরব জাতিকে ভাই বানালেন, ঐক্যহীনকে ঐক্যবদ্ধ করলেন, বিশৃঙ্খল আনুগত্যহীন জনগোষ্ঠীকে সুশৃঙ্খল ও আনুগত্যশীল করলেন। বাকি পৃথিবীতে এই সত্যদীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্যের সমন্বয়ে একটা সভ্যতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেলেন তাঁর হাতেগড়া উম্মাহর উপর। তারা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অর্ধপৃথিবী ইসলামের তথা সুনিবিড় শান্তির ছায়াতলে নিয়ে আসেন। সেখানে এমন শান্তি, শৃঙ্খলা, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় যে একজন সুন্দরী যুবতী সারা গায়ে স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করতে পারত, তার মনে কোনো প্রকার ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হতো না। এমন স্বচ্ছলতা এসেছিল যে, মানুষ উটের পিঠে খাদ্য আর ধন-সম্পদ বোঝাই করে শহরে গ্রামে ঘুরে বেড়াতো কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কাউকে খুঁজে পেত না। মানুষের নৈতিক চরিত্র এতটাই উন্নত হয়েছিল যে অপরাধী নিজেই বিচারকের কাছে এসে প্রায়শ্চিত্ত

করার জন্য সাজা প্রার্থনা করত। কিছুদিন আগেও যে আরবরা ছিল জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত, পৃথিবীর সকল জাতির দ্বারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, তারাই এমন একটি সুসভ্য, আদর্শ জাতিতে পরিণত হলো যে সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তারা মানবজাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হলো। রসুলাল্লাহর বিদায় নেওয়ার ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত জাতির সামনে তাদের লক্ষ্য, আকিদা সুস্পষ্ট ছিল। তারা একদেহ একপ্রাণ হয়ে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে লড়াই করে গেছেন। তারপর ঘটল এক মহা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। জাতি তার আকিদা ভুলে গেল। যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে অপরাজেয় জাতি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য ভুলে গেল। ফলে যে জেহাদ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সেই জেহাদ রূপান্তরিত হলো রাজ্যজয়ের যুদ্ধে। ইসলামের খলিফারা সুলতান হয়ে গেলেন, তারা অপরাপর রাজা-বাদশাহদের মতোই পাশবিক ভোগ বিলাসে নিমজ্জিত হলেন।

অন্যদিকে জাতির মধ্যে জন্ম নিল আল্লামা, মোহাদ্দেস, মোফাসসের, মুফতি এবং ভারসাম্যহীন সুফী-সাধক শ্রেণি যারা সহজ সরল সেরাতুল মুস্তাকীম, দীনুল হকের শরিয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েল আবিষ্কার করে বহু মতের সৃষ্টি করলেন আর ভারসাম্যহীন সুফিরা জাতির সংগ্রামী চরিত্রকে উল্টিয়ে ঘরমুখী, অন্তর্মুখী করে স্থবির, নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ করে দিল। ফলে একদা অর্ধ-বিশ্বজয়ী দুর্বার গতিশীল জাতিটি হাজারো ফেরকা, মাজহাব, দল-উপদল, আধ্যাত্মিক তরিকায় বিভক্ত, স্থবির কিছু উপাসনা ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলো। অতি বিশ্লেষণকারী পণ্ডিত এবং বিকৃত সুফী এই উভয় শ্রেণির কাজের ফলে ইসলামের উদ্দেশ্যই পাল্টে গেল। সংগ্রাম করে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে ধর্মের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ালো আত্মার উন্নয়ন এবং জীবনের ব্যক্তিগত অঙ্গনের ছোট খাটো বিষয়ের মাসলা মাসায়েল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা।

জাতি ভুলে গেল যে সারা পৃথিবীতে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিত্যাগ করলে আল্লাহও তাদের পরিত্যাগ করবেন এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে অন্য জাতির গোলাম বানিয়ে দেবেন বলে তাঁর কোর'আনে সাবধানবাণী উল্লেখ করেছেন (সুরা তওবা ৩৯)। নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর শাস্তি এসে গেল। প্রথমে মঙ্গোলরা এসে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো দখল করে নিল, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মাথা দিয়ে পিরামিড তৈরি করল। কিন্তু তবুও তারা সঠিক লক্ষ্যে ফিরে আসেনি, একদেহ একপ্রাণ হয়ে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থ সংগ্রাম করেনি। বরং পূর্বের মতোই তর্ক-বাহাস, মারামারি করে যেতে লাগল, আর হুজরায়, খানকার চার দেয়ালে আত্মার ঘষামাজা করে যেতে লাগল। ফলে আল্লাহর চূড়ান্ত শাস্তি হিসেবে ইউরোপ থেকে এলো ইংরেজ, ডাচ, পর্তুগীজ ইত্যাদি জাতিগুলো। মরক্কো থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত প্রায় সমগ্র মুসলিম দুনিয়া তাদের পায়ের নিচে চলে গেল। সেই থেকে মুসলিম জাতি এখনও সেই দাসত্বের বোঝা বয়ে চলেছে।

ব্রিটিশরা এই জাতিকে পদানত করার পর এরা যেন কোনো দিন আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে এজন্য একটি শয়তানি ফন্দি আঁটে। তারা এ জাতির মানুষের মন ও মগজকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য দু'টি সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করে, যথা: মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। তাদের অধিকৃত সকল উপনিবেশেই তারা মুসলমানদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার নাম করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে তারা নিজেদের মনগড়া একটি বিকৃত-বিপরীতমুখী ইসলাম শিক্ষা দেয়। মাদ্রাসাগুলোর অধ্যক্ষপদ তারা নিজেদের হাতে রেখে দীর্ঘ ১৪৬ বছর এই উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে তাদের তৈরি 'ইসলাম' শিক্ষা দিয়েছে। এখানে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই কথিত ইসলাম বিক্রী করে রোজগার করা ছাড়া আর কোনো পথ না থাকে। খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রী করে উপার্জন করতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত ইসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; এ উপমহাদেশসহ ব্রিটিশ খ্রিস্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত মুসলিম দেশগুলোতে এই একই নীতি কার্যকর করেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ সফল হয়েছে।

ধর্মহীন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটি তারা চালু করল স্কুল কলেজের মাধ্যমে। এ ভাগটা তারা করল এই জন্য যে, এ বিরাট এলাকা শাসন করতে যে জনশক্তি প্রয়োজন তা এদেশের মানুষ ছাড়া সম্ভব ছিল না; সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজে অংশ নিতে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা দেওয়ার জন্য তারা এতে ইংরেজি ভাষা, সুদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস (প্রধানতঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের রাজা-রাণীদের ইতিহাস), ভূগোল, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখল; সেখানে আল্লাহ, রসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই রাখা হলো না। সেই সঙ্গে নৈতিকতা, মানবতা, আদর্শ, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষাও সেখানে স্থান পেল না। তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হলো যাতে তাদের মন শাসকদের প্রতি হীনম্মন্যতায় আপ্লুত থাকে এবং পাশাপাশি তাদের মন-মগজে, আল্লাহ, রসুল, দীন সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ (A hostile attitude) সৃষ্টি হয়। বিশ্ব-রাজনৈতিক কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশগুলোকে বাহ্যিক স্বাধীনতা দিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা ক্ষমতা দিয়ে যায় এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটির উপর যারা চরিত্রে ও আত্মায় ব্রিটিশদের দাস। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া সেই শিক্ষাব্যবস্থা আজও চালু আছে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী নামে

খ্রিষ্টান হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ.) এর অনুসারী ছিল না। ঈসা (আ.) এর শিক্ষাকে বহু পূর্বেই তারা বাদ দিয়ে ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

মুসলমানরা পৃথিবীর সর্বত্র শত শত বছর ধরে নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, জাতিগত সহিংসতার শিকার হচ্ছে, তাদেরকে মেরে-কেটে জন্মভূমি থেকে উৎখাত করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের নারীদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, তাদের দেশগুলো একটার পর একটা গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান উদ্বাস্তু-শিবিরে বাস করছে, তাদের শিশুরা সাগরে ডুবে মরছে। এগুলো সবই হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন না করার শাস্তিস্বরূপ। যতদিন না তারা তাদের সেই দায়িত্বকে পুনরায় কাঁধে তুলে নেবে, ততদিন তাদের মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই নিকৃষ্ট পরিণতি থেকে মুক্তির একটি সুযোগ আল্লাহ মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মাধ্যমে। এমামুয্যামান তাঁর শৈশবকাল থেকেই ভাবতে থাকেন কী করে, কোনো পথে মানুষের মুক্তি সম্ভব? আল্লাহ তাঁকে পথ দেখালেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হচ্ছে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ। সেই তওহীদ হচ্ছে, আল্লাহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক বলে গ্রহণ করা। বর্তমানে মুসলিমসহ সমগ্র মানবজাতি এই তওহীদ থেকে বিচ্যুত। যেদিন তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথা সামাজিক, আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি কোথাও আল্লাহর হুকুম মানবে না, আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী বিধান নিজেদের মন মতো তৈরি করে তা দিয়ে জীবন চালাবে সেদিনই তারা বর্তমান বিশ্বে চলমান অশান্তির বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করল। আজকে সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা গজিয়েছে এবং এখন তার কুফল ভোগ করছে মানুষ।

মানুষের একজন স্রষ্টা আছে। সেই স্রষ্টাকে যখন বাস্তব জীবন থেকে বাদ দেয়া হলো তখন যাবতীয় সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতার উৎসের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মানুষ অতি মহান একটি সৃষ্টি থেকে দুরাচারী, স্বৈরাচারী, মানবেতর জীবে পরিণত হলো। এখন এ পরিস্থিতি থেকে মানুষের মুক্তির উপায় কী? সেই উপায় হচ্ছে মানবজাতিকে আবার তার প্রকৃত পরিচয় স্মরণ করা। এটা স্মরণ করা যে প্রতিটি মানুষ একই জাতিভুক্ত, একই বাবা-মায়ের সন্তান। তারা একজন আরেকজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে পারে না, বিনাশ করতে পারে না, একজন আরেকজনকে বিষ খাওয়াতে পারে না। এখন যেকোন মূল্যে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হতে প্রয়োজন একটি সাধারণ ঐক্যসূত্র, একটি পথ। সেই পথটি হচ্ছে তাদেরকে আবার প্রত্যাবর্তন করতে হবে সেই সনাতন চিরন্তন শাশ্বত সত্যের উপরে। সবাই মিলে বলতে হবে এক আল্লাহর হুকুম ছাড়া আমরা কারো হুকুম মানব না, যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্যের

বিরুদ্ধে আমরা হব ঐক্যবদ্ধ। এ লক্ষ্যেই মাননীয় এমামুয্যামান ১৯৯৫ সালে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন।

হেযবুত তওহীদ আল্লাহর সৃষ্ট আন্দোলন, কারণ এর প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর ইচ্ছায় গৃহীত হয়। এই পবিত্র আন্দোলন আল্লাহর অশেষ রহমতে ১৯৯৫ সাল থেকে পথ চলছে। আল্লাহ তাঁর অপরিসীম সাহায্য হেযবুত তওহীদের উপরে ঢেলে দিয়েছেন। হেযবুত তওহীদের কর্মসূচি কী হবে তা আন্দোলন প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনেই আল্লাহ একটি সহীহ হাদীস থেকে বুঝিয়ে দেন। এই আন্দোলনের কর্মসূচিটি তাই কোনো মানবীয় চিন্তাপ্রসূত কর্মসূচি নয়, এটি প্রণয়ন করেছেন এই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও প্রভু স্বয়ং আল্লাহ। সেই কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে হেযবুত তওহীদ এতদিন চলেছে। কিন্তু আন্দোলনের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করতেই এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ী আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণ অপপ্রচার চালিয়েছে। হেযবুত তওহীদের বিষয়ে মানুষের মনে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে দিয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে প্রশাসন, গণমাধ্যম সর্বত্র। বিশ্বজুড়ে ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণার প্রত্যক্ষ প্রভাবে অনেক গণমাধ্যমকর্মী না জেনে হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ, জঙ্গি, গোপন আন্দোলন আখ্যা দিয়ে পত্রিকা ও টিভিতে প্রচার চালিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে হেযবুত তওহীদকে প্রচণ্ড সামাজিক ও প্রশাসনিক হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। পাঁচ শতাধিকবার আমাদের সদস্যদেরকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু গোপন ও প্রকাশ্য তদন্তে একটি ক্ষেত্রেও একজন সদস্যেরও কোনো অপরাধ বা আইনভঙ্গের প্রমাণ পায় নি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তবু এই গ্রেফতারের প্রতিটি ঘটনা গণমাধ্যমগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমনভাবে প্রচার করেছে যে এই সত্যনিষ্ঠ, আইনমান্যকারী আন্দোলন সম্পর্কে দেশবাসী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, যে মহাসত্য আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন তার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই আমরা দমে না গিয়ে সর্বাত্মকভাবে মানুষের কাছে তাদের মুক্তির একমাত্র পথটি তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমরা জানি, মানুষ দীর্ঘদিন থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা নিজেদের জীবনে কার্যকরী করে দেখেছে যেগুলো মানবজাতিকে শান্তি দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এখন তাদের সামনে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তা হলো আল্লাহর দেওয়া ভারসাম্যপূর্ণ সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা যা একাধারে মানুষের বৈষয়িক জীবনের সকল ক্ষেত্রের প্রগতি ঘটাবে, অপরদিকে মানুষের নৈতিক গুণাবলীকে চরম উৎকর্ষে নিয়ে যাবে।

১৯৪৭ সনে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে যখন মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো তখন বলা হয়েছিল যে এটি ইসলামের নীতি মোতাবেক পরিচালিত হবে। নাম রাখা হয়েছিল ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ছিল নিছক প্রতারণামূলক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। ব্রিটিশ আমলে

গজিয়ে ওঠা বুর্জোয়া মুসলিম পরিবারগুলোর সন্তানেরা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লাভ করলেন এবং তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পাকিস্তানকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের অনুকরণেই পরিচালিত করলেন। কিন্তু ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে গেলেন। সেই শাসকগোষ্ঠী, সামরিক-বেসামরিক আমলাশ্রেণি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কখনও ধারণ করে নি, ফলে ইসলামের নামে দেশ ভাগ করলেও ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ ইসলামের প্রতিশ্রুত সাম্য, ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এক কথায় তারা ইসলাম পায় নি। উপরন্তু তারা দেখেছে ধর্ম ব্যবহার করে অপরাজনীতি, শোষণ ও ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার নিকৃষ্ট উদাহরণ। ২৪ বছরের নিপীড়ন, শোষণ, অবিচার আর বঞ্চনার দ্বারা মানুষের হৃদয়ে যে ক্ষোভ আর ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল ১৯৭১ সালে। দেশের আপামর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করল। আমরা একটি মানচিত্র পেলাম। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের এই জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি একদিনের জন্যও ঐক্যবদ্ধ থাকতে দেয় নি। ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটি একদিকে নানা ফেরকা মাজহাব আর অপরাজনীতি করে গেছে আর অপরদিকে পাশ্চাত্য থেকে ধার করা ঐক্যবিনাশী বিভিন্ন মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে সারাবছর হামলা-পাল্টা হামলা, ভোটাভুটি নিয়ে রক্তারক্তি, হরতাল, অবরোধ চালিয়ে গেছে। ফলে স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত সুফল আমরা ভোগ করতে পারি নি, শান্তি আসে নি। সরকারগুলো বস্তুগত উন্নতির চেষ্টা করেছে, বিরোধীরা সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে গিয়ে প্রতিবাদের নামে জাতির সম্পদ ধ্বংস করেছে।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। আধুনিক গতিশীলতার যুগে একটি জাতিকে পৃথিবীর বুকে সম্মানজনক আসন লাভ করতে এই অর্ধ-শতাব্দী কম সময় নয়। কিন্তু আজও আমরা দারিদ্র্যের সাথেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি, হাজার হাজার ডলার বৈদেশিক ঋণের বোঝা এ জাতির মাথার উপরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় এ দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি, কিন্তু এখন আমরা সংখ্যায় ১৬ কোটি যাদের বিরাট একটি অংশ তরুণ, উদ্যমী, কর্মক্ষম এবং পরিশ্রমী। আমাদের মাটি অত্যন্ত উর্বর। আমাদের রয়েছে বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ, রয়েছে নদী, সমুদ্রসীমা যা উন্নয়নের বড় নিয়ামক। সব মিলিয়ে আমরা যদি নিজেরা স্বার্থ, ক্ষমতা, রাজনীতি আর ধর্ম নিয়ে হানাহানি না করে যাবতীয় সুস্পষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী একটি জাতিসত্তা গড়ে তুলতে পারতাম তাহলে এতদিন আমরা অর্থনৈতিক, সামরিক, শিক্ষা, প্রযুক্তি, কৃষি এক কথায় সর্বদিক থেকে পরাশক্তিতে পরিণত হতে পারতাম। সেখানে আমরা এখনও মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার জন্য কতই না চেষ্টা করছি। যাহোক, সময় ফুরিয়ে

যায় নি। এখনও আমরা চাইলে অন্তর্কলহ ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, তাহলে চলমান বৈশ্বিক সংকট ও আঞ্চলিক সংকট থেকে নিজেদের দেশ ও জাতিকে নিরাপদ রাখতে পারব। নয়তো ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশগুলো যেভাবে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদেরকেও হয়তো তেমন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এ সংকটের কারণ ও প্রতিকারকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার আহ্বান আমরা সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরছি।

আল্লাহর শোকর, আলহামদুলিল্লাহ এখন দেশময় আপামর জনসাধারণ, শিক্ষক, ছাত্র, পেশাজীবী, প্রগতিশীল মানুষ, আলেম তথা সর্বশ্রেণির মানুষ বর্তমানে হেযবুত তওহীদের যাবতীয় গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন, সমর্থন করছেন। এর কারণ তারা আমাদের বক্তব্য সরাসরি আমাদের মুখ থেকে, আমাদের বই-পুস্তক, আমাদের তৈরি করা প্রামাণ্যচিত্র থেকে জানতে পারছেন, প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিচ্ছেন। এভাবেই মানুষ প্রকৃত সত্যের সংস্পর্শে এসে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছে এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ তথা মো'মেন হওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছে।

হেযবুত তওহীদের সবচেয়ে বড় মাইলফলক হচ্ছে, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে মহান আল্লাহ এক মহান অলৌকিক ঘটনা সংঘটন করেন যার দ্বারা তিনি তিনটি বিষয় সত্যায়ন করেন। যথাঃ হেযবুত তওহীদ হক (সত্য), এর এমাম আল্লাহর মনোনীত হক এমাম, হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে (ইনশা'ল্লাহ)।

এ আন্দোলনের একটি অনন্যতা হলো, প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদ একটিও আইনভঙ্গ করে নি, এর কোনো সদস্য একটিও অপরাধ করে নি। এর প্রমাণ, আন্দোলনের সদস্যদের বিরুদ্ধে শত শত মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু একটি মামলাতেও এর কোনো একজন সদস্যেরও কোনো আইনভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় নি এবং । এটা আমাদের মুখের দাবি নয় বরং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বক্তব্য। আইন মান্য করার এরূপ দৃষ্টান্ত কোনো রাজনৈতিক অরাজনৈতিক আন্দোলন বা কোনো প্রতিষ্ঠান দেখাতে পারে নি।

আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা যে নিয়ম, পদ্ধতি ও কর্মসূচি মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করেছি তার লিখিত কোনো রূপ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তারের কারণে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে আন্দোলনের সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনে একটি গঠনতন্ত্র তৈরি জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে হেযবুত তওহীদের আগামী দিনের পথ চলার জন্য একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়াস পাই।

হেযবুত তওহীদ নবজাগরণ (রেনেসাঁ) সৃষ্টি করতে চায়

ধর্মীয় দর্শন ও বৈজ্ঞানিক সূত্র উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে অন্য সব প্রাণীর মৌলিক তফাৎ রয়েছে। এবং এটা সর্বজনস্বীকৃত, বৈজ্ঞানিকভাবেও স্বীকৃত। মানুষ একটি অসাধারণ সৃষ্টি। কোনো প্রাণীর প্রখর ঘ্রাণশক্তি আছে, কিন্তু তার সেরকম প্রখর দৃষ্টিশক্তি নেই। কোনো কোনো প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি সাংঘাতিক কিন্তু সে আবার বর্ণান্ধ। কারো গায়ে অনেক শক্তি কিন্তু তার শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। কিন্তু মানুষ হচ্ছে এমন এক সৃষ্টি যার মধ্যে সকল প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি সমন্বয় ঘটেছে। মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক দিয়ে সে চিন্তা করে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে।

আরেকটি অসাধারণ, বিস্ময়কর সত্ত্বা মানুষের মধ্যে বিরাজ করে, সেটা হচ্ছে তার আত্মা যাকে কেউ বলেন বিবেক, চিন্তাশক্তি, উপলব্ধি করার ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, মন ইত্যাদি। আল্লাহর ভাষায় এটাই হচ্ছে রূহাল্লাহ বা আল্লাহর আত্মা যার মধ্যে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও রয়েছে, যদিও তা অতি ক্ষুদ্র মাত্রায়। বস্তু হলে তা চোখে দেখা যায়, তার আয়তন ভর পরিমাপ করা যায়। কিন্তু যা অবস্তু যেমন কোনো সঙ্কট, সেটা কত বড় সঙ্কট, তার ভয়াবহতা কী তা মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝতে হয়, আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যদি কারো সম্মানের ব্যাপার হয় তাহলে সেই সম্মানের মাহাত্ম্য, উচ্চতা উপলব্ধি করতে হয় হৃদয় দিয়ে। যে জাতির চিন্তার জগতে স্থবিরতা নেমে আসে তাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়। কিন্তু সমাজের শিক্ষিত শ্রেণিটি (খুবই নগণ্য সংখ্যাক ব্যতিক্রম বাদে) আধুনিকতার অহংকারে এতটাই স্ফীত হয়ে আছে যে, তারা এই সভ্যতাকে এই সমাজকে প্রগতিশীল সমাজ বলে। কারণ এই সময়ে মানুষ এত প্রযুক্তিগত উন্নতি করেছে যা দেখে তারা বিমুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে যে আমরা এখন সভ্যতার শিখরে উঠে পড়েছি। সে একশ-দেড়শ তলা হাইরাইজ বিল্ডিং বানাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বর্তমানের চেয়ে বেশি স্থবিরতা, সমাজে ও মগজে

এত আবদ্ধতা, এত সংকীর্ণতা মানব ইতিহাসে আগে কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রযুক্তি যতখানি উপরে উঠেছে মানুষ হিসেবে সে তার চেয়ে বহুগুন নিচে নেমেছে।

এটা মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে, মানুষের সবচেয়ে বড় পরাজয় ঘটে কখন? যখন সমাজ অন্যায় অবিচারে পূর্ণ অথচ মানুষ সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, ভিতরে প্রতিবাদের চেতনাও জাগ্রত হয় না, তখনই মানুষের সবচেয়ে বড় পরাজয়। যখন দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা, মজলুমের উপর জালেমের নির্যাতন মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে না তখন তো তার মনুষ্যত্বের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা। এমতাবস্থায় সে কীভাবে সভ্যতা ও প্রগতির অহংকার করে? আজকে প্রতিটি সমাজে, প্রতিটি দেশে মানুষ অন্যায়ের কাছে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেছে। সে অন্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে। সে তার চোখ, কান, মুখ সব বন্ধ করে ফেলেছে। সে আর দশটা পশুর মতো কেবল জীবনধারণে ব্যস্ত। ব্যক্তিগত আয়ুটাকেই সে জীবন মনে করছে। মানুষ এখন মৃত।

আজকের এই সময়টির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, যদি কান পেতে শুনি, যদি আমাদের হৃদয় দিয়ে সময়টাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, যদি আমাদের চিন্তাশক্তি দিয়ে বিবেচনা করি তাহলে আমরা সম্যকভাবে জানতে পারব যে আমি নিজে কী অবস্থায় আছি এবং গোটা মানবজাতি কী অবস্থায় আছে। এই ঘোর অমানিশা, এই দুর্দশা দেখে সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ আজ দিশেহারা। পৃথিবীতে এই মুহুর্তে ষোলো হাজার এটমবোমা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মানুষকে হত্যা করার জন্য। হিরোশিমা-নাগাসাকির ক্ষত এখনও শুকায় নি। সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলো নিত্য নতুন ভয়াবহ সব মারণাস্ত্র তৈরি করে মহড়া দিচ্ছে। তারা প্রতিনিয়ত একে অপরকে পাড়ার মাস্তানের ভাষায় হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, অস্ত্রের ভাষায় কথা বলছে। সীমান্তে সীমান্তে চলছে সংঘর্ষ রক্তপাত। সামরিক বিশেষজ্ঞ, নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা যেকোন মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা উদ্বেগের সঙ্গে প্রকাশ করছে। সাম্প্রদায়িক উস্কানি, হানাহানি, স্বার্থের রাজনীতি সমস্ত দুনিয়াটাকে একটা নরককুণ্ডে পরিণত করেছে। এ যেন মহাকবি দান্তের সেই ইনফার্নো।

এই যে ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুনিয়াজুড়ে তা থেকে আমাদের এই দেশটিও বিচ্ছিন্ন নয়। এই বাংলার মাটিতে আমি জন্ম নিয়েছি। এ মাটিতে আমার পূর্বপুরুষের অস্থিমজ্জা মিশে আছে। ১৯৭১ সালে এর পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের বীর জনতা দেশটাকে স্বাধীন করেছিল। সেই থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে চলল। আজকে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে নিয়েও ভেতরে-বাইরে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র চলছে। এখানে জঙ্গিবাদী তাণ্ডব সৃষ্টি করে, উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রদর্শনী ঘটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো নতুন একটি যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী পাঁয়তারা চলছে। সূত্র হচ্ছে

এখানেও প্রায় ৯০% মানুষ ধর্মপরিচয়ে মুসলমান, আর বিশ্বজুড়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলামানদেরকে মানবতার শত্রু বলে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে এবং তাদের দেশগুলো একে একে নানা কায়দায় আগ্রাসন চালিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হচ্ছে, দখল করে নেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের দেশকে নিরাপদ রাখতে হলে আমাদের সকলকেই ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ কোথাও সরকার একা তার দেশকে পশ্চিমা সামরিক আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে পেরেছে এমন নজির একটিও নেই। ষোলো কোটির এই জাতি যদি দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একতাবদ্ধ হয়ে যাবতীয় জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা ইত্যাদি অপশক্তিকে রুখে দেয় তাহলেই সম্ভব হবে দেশকে রক্ষা করা, কেননা সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয় অনৈক্য ও বিভাজনের সুযোগ নিয়েই সেখানে অনুপ্রবেশ করে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ একসময় এ divide and rule (ভাগ কর, শাসন কর) নীতিতেই আমাদেরকে দখল ও শোষণ করেছে এটা সকলেরই জানা।

আমাদের দেশের সরকারগুলোও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এটা প্রমাণিত সত্য যে, শুধু শক্তি প্রয়োগ করে মতবাদগত সন্ত্রাস কখনও নির্মূল করা যায় না। একটি অন্যায়, অবিচারপূর্ণ সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যুগে যুগে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে, কেউ তাদের সন্ত্রাসের পক্ষে ধর্মকে আশ্রয় করেছে, কেউ জাতীয়তাবাদকে, কেউ সাম্যবাদকে। আমরা হেযবুত তওহীদ ২০০৯ সন থেকে সরকারের প্রতি প্রস্তাবনা পেশ করে আসছি, পত্র-পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে, বই পুস্তক প্রকাশ করে, জনসভা-সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে বলে আসছি যে জঙ্গিবাদীরা যে আদর্শ (Ideology) মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তাদেরকে প্রভাবিত করছে আমাদের উচিত সেই আদর্শের ত্রুটিগুলো মানুষের সামনে যুক্তি প্রমাণ ও ধর্মীয় রেফারেন্স দিয়ে (Counter Narrative) সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যেন মানুষের ধর্মীয় চেতনা ভুল পথে, মানবতাবিধ্বংসী পথে পরিচালিত না হয়। সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে ট্যাকটিক্যাল ওয়ার বা কৌশলগত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাশাপাশি Ideologicla war বা আদর্শিক লড়াইও অপরিহার্য। কেননা ধর্মীয় চেতনার অপব্যবহার এমনই একটি বিষয় যা কেবল বুলেট বোমা দিয়ে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এই ধর্মীয় চেতনার অপপ্রয়োগ, ধর্মের উদ্দেশ্যমূলক অপব্যাখ্যার বিপরীতে ধর্মের প্রকৃত আদর্শ তুলে ধরাই আমাদের মূল কাজ যার মাধ্যমে এই সকল বিষবৃক্ষকে শেকড়সুদ্ধ মানুষের মগজ ও হৃদয় থেকে উপড়ে ফেলা, পাশাপাশি যে ধর্ম মানুষকে উন্নত জীবে পরিণত করে, প্রগতিশীল করে, ভারসাম্য দেয়, ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আত্মিক প্রেরণা দান করে সেই শিক্ষাগুলোকে মানুষের সামনে মেলে ধরা। তাহলেই আবার এ জাতির মধ্যে চিন্তার জাগরণ হবে, মগজের বন্ধ দরজাগুলো খুলে যাবে, নতুন করে আবার তারা একটি রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটাবে।

যখন কোনো সমাজ অচলায়তনে পরিণত হয়, প্রথাগুলো প্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডূকতা প্রবল শক্তিমান হয়ে ওঠে, অযৌক্তিক বিজ্ঞানহীন চিন্তাচেতনায় মাকড়শার জালে বন্দী পতঙ্গের ন্যায় সমাজ ছটফট করতে থাকে তখন সেই জালকে ছিন্ন করতে আবির্ভূত হন কিছু দৃষ্টিবান মানুষ যারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য। তারা ইতিহাসের গতিপথকে পাল্টে দেন। তাদের এই সম্মিলিত আঘাতকে বলা হয় রেনেসাঁ। মানবজাতি বার বার এই রেনেসাঁর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে মানবসভ্যতার চিন্তাজগতে সাম্প্রতিকতম রেনেসাঁটি হয়েছিল ইউরোপে। আধুনিক এই সভ্যতার জন্ম হয়েছিল সেই রেনেসাঁর হাত ধরেই। মানুষের হৃদয়ে তখন পরিবর্তনের বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছিল, কারণ মানুষ তাদের সঙ্কট উপলব্ধি করেছিল। আর পরিবর্তনের এই তীব্র বাসনাটাই ছিল ওই রেনেসাঁর প্রধান নিয়ামক।

মধ্যযুগের ইউরোপে দীর্ঘকাল থেকে চলছিল দাসপ্রথা, সামন্তপ্রভুদের দুঃশাসন। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের ফতোয়ার তরবারিতে নির্দোষ মানুষের রক্তসাগর বয়ে গিয়েছিল। ধর্মযাজকদের কথা ছিল, তাদের কথা মানলে পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, না মানলে নরক। কথায় কথায় তারা ফতোয়া দিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মারতো, নৃশংস উপায়ে হত্যা করত। একদিকে সামন্তবাদী প্রভুদের বিপুল ভোগ-বিলাস আর ক্ষমতার চাবুক, অন্যদিকে ধর্ম যাজকদের ফতোয়ার নিপীড়ন, অপরদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য আর বঞ্চনা। এ যেন ত্রিদন্ত বিশিষ্ট ভয়ংকর প্রাণী যার হাত থেকে কিছুতেই মুক্তি মিলছিল না সাধারণ মানুষের। যারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কথা বলতেন, যারা চিন্তাশীল, বিজ্ঞানী, সংস্কারপন্থী দার্শনিক ছিলেন তাদেরকে ধর্ম-অবমাননার অভিযোগে পুড়িয়ে মারা হতো। এই সময়কেই বলা হয় Dark Age বা অন্ধকারের যুগ, জাহেলিয়াতের যুগ।

তখন ধর্মযাজকদের প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, জড়ত্ব, স্থবিরতা, অন্ধত্ব, সবকিছুর মধ্যে পরকালীন শাস্তির ভীতিপ্রচার, নিজেদের ঐশ্বরিকতা ইত্যাদি ধ্যান-ধারণা থেকে বাইরে বের হবার চেষ্টা করেছে শ্বাসরুদ্ধ মানুষ। তাদের চিন্তাকে ঐ জড় ধর্মচিন্তার কারাগার থেকে বের করে এনেছে বহু জীবনের বিনিময়ে, রক্তের বিনিময়ে, বহু প্রজন্মের সম্মিলিত প্রয়াসে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর রাজতন্ত্রের যাঁতাকলের নিষ্পেষণ থেকে অসহায় মানবতাকে পরিত্রাণ করতে ইউরোপের সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা করতে লাগলেন, নাট্যকাররা নাটক লিখতে লাগলেন, কবিরা কবিতা লিখলেন, শিল্পিরা ছবি আঁকলেন। তাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানুষের চিন্তার বন্ধঘরের তালা খুলে গেল, নতুন নতুন জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচিত হলো। সাংঘাতিক এক রেনেসাঁর সৃষ্টি হল। সে অচলায়তন থেকে বের হয়ে মানুষ দেখল যে, না আসলেই তো আমার অনেক চিন্তা করার বিষয় আছে। সে একটা মুক্ত আকাশ পেয়েছে। এই যে চিন্তার মুক্তি তা মানুষকে নতুন একটি সভ্যতার সম্ভাবনার ঊষালগ্নে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এরই নাম তারা দিয়েছে রেনেসাঁ (renaissance), নবজাগরণ।

সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-সাহিত্যের একটা স্ফূরণ ঘটে গেল। সেই সকল রেনেসাঁর ফলেই আজকে আমরা মানবজাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত এই উন্নতির যুগে উপনীত হয়েছে।

যারা ইউরোপীয় রেনেসাঁর অগ্রনায়ক তাদের লক্ষ্য ছিল এই পৃথিবীটাকে তারা স্বর্গে অর্থাৎ শান্তিময় আবাসে রূপান্তরিত করবেন। একদিকে বিকশিত হলো শিল্প-সাহিত্য, প্রযুক্তি আরেকদিকে জীবন চালানোর জন্য একটার পর একটা সৃষ্টি হলো উদারনৈতিক গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আন্তর্জাতিকতাবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি। এগুলো তারা রচনা করলেন ঐ চিন্তাশক্তি দিয়ে, মস্তিষ্ককে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে। কিন্তু মানুষ এতই স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন যে, সে এমন কোনো জীবন বিধান প্রণয়ন করতে পারেনি যা একাধারে তার ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করবে, পরিবারকে শান্তিপূর্ণ রাখবে, অর্থনীতিকে ভারসাম্যযুক্ত রাখবে- এক কথায় ব্যক্তিগত, জাতীয়, সামাজিক জীবনে শান্তি আনতে পারে। যাহোক, তবুও তারা করেছে। যারা করেছে তারা নিজেদের সমাজের সঙ্কটটাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই সভ্যতা বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি মানবজাতিকে এমন একটি নির্মম বাস্তবতা উপহার দিয়েছে যা অতীতের সব ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে গেছে। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে রেনেসাঁর যে নেটফল মানুষ লাভ করেছে তাতে তাদের সকল প্রাপ্তি অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিশ্বমানবতা সেই দানবিক শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছে। এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সেই মহান রেনেসাঁ কার্যত একটি আত্মাহীন একপেশে আখেরাত-বর্জিত, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানশূন্য, ভারসাম্যহীন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে যা আসলে কোনো সভ্যতাই নয়, বরং ভোগবাদী একটি যান্ত্রিক প্রগতিমাত্র (Utilitarian Technological advancement)।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে জ্ঞানের ভারসাম্যহীনতার ফলে, ন্যায়-নীতির ভুল মানদণ্ডকে ধারণ করার কারণে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও মানুষকে এখনও তাদের বাস্তবজীবনে চরম অন্যায়-অবিচার, খুন-ধর্ষণ, নিরাপত্তাহীনতা, দুঃখ-ক্লেষ, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাতের মধ্যেই বাস করতে হচ্ছে। যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছিল আশীর্বাদ সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই অপশক্তির কুক্ষিগত হওয়ার কারণে মানবতার বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানবজাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত করেছে, ফেলে দিয়েছে অস্তিত্বের সংকটে। আজও চলছে শক্তিমানের শাসন, পুরো মানবজাতি ন্যায়-অন্যায় ভুলে পারমাণবিক শক্তির সামনে, তাদের যাবতীয় অন্যায়ের সামনে আত্মসমর্পণ করে আছে। গ্রাম থেকে শুরু করে বিশ্ব সর্বত্র এখন সরলের উপর ধূর্তের প্রতারণা, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা, শাসিতের উপর শাসকের জুলুম। নিরপরাধ শিশুর রক্তে আজ পৃথিবীর মাটি ভেজা। যেন সেই অন্ধকার যুগের (Dark age) প্রেতাত্মা এই সময়ের কাঁধে ভর করেছে।

যারা সমাজের সচেতন মানুষ, যারা শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, পত্র-পত্রিকা নিয়ে আছেন সবার আগে তাদেরকে বর্তমানের সঙ্কটের ভয়াবহতা আত্মা দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। চিন্তা করতে হবে যে আজকের আন্তর্জাতিক সঙ্কট, জাতীয় সঙ্কট কতখানি গভীর। আজ চোখের সামনে মানুষ হত্যা হচ্ছে, অন্য মানুষ কোনো প্রতিবাদ করে না; চোখের সামনে নগর ধ্বংস হচ্ছে, মানুষ নির্বিকার টিভি দেখছে, প্রতিকারের কোনো চেষ্টাই নেই। চোখের সামনে লুটপাট হচ্ছে, চাঁদাবাজি হচ্ছে, কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না, দেখেও দেখছে না। ভাবছে - দেখে কী লাভ? এর অর্থ মানুষ অন্যায়কারীর কাছে, শক্তিমানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ভাবছে আমি কোনোমতে জীবনটা কাটাই। এখন এই দুর্বলকে কে জাগাবে? কে তাদের ডেকে তুলবে? কে নতুন একটি রেনেসাঁ, নবজাগরণের সূচনা করবে? কে নতুন সভ্যতার আলো ছড়াবে? শিক্ষিত মানুষ কর্পোরেট বাণিজ্যের গোলাম হয়ে গেছে। অর্থের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছে। এখন আমাদের প্রগতি নয় অধঃগতি, এখন উন্নতি নয় পতন, আমাদের এখন কেবল পরাজয়। আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ তো একটা পরিণতি, আমাদের সবার অথর্বতা, স্থবিরতা, নিষ্ক্রিয়তার যোগফলমাত্র। সেই ধ্বংস, পরিণতি সামনে। এখনও বুঝতে হবে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্কটটা কী। চোখে তো প্রতিদিনের বিপর্যয় দেখতেই পাচ্ছেন, আর কত দেখবেন? আর দেখার কি আছে? এরপরেও দৃষ্টি ক্লান্ত হচ্ছে না? এখনই সময় আরেকটি নবজাগরণের যে জাগরণ হবে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইউরোপের সেই রেনেসাঁর ফলে সৃষ্ট বস্তুবাদী ভারসাম্যহীন সভ্যতার পারদ এখন নিম্নগামী। সে সভ্যতা আমাদেরকে বহু প্রযুক্তি (Technology), বস্তুগত, বৈষয়িক উন্নতি দিয়েছে, কিন্তু মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি। এটা পারবেও না। এখন সে সভ্যতা পুনরায় শক্তির শাসনে (Might is right) পর্যবসিত হয়েছে। রেনেসাঁর অগ্রনায়কদের সদিচ্ছার হয়তো কমতি ছিল না কিন্তু তাদের আবিষ্কৃত ফর্মুলা বা পদ্ধতিগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ দিতে পারে নি, একদিনের জন্যও শান্তি দিতে পারে নি। পাশবিক ভোগ বিলাসে মত্ত হয়েছে একটি ধনিক শ্রেণি। পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ কুক্ষিগত করে নিয়েছে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি, কয়েকটি রাষ্ট্র। বিশ্ব আজ স্বর্গের বদলে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে যার কারণ সেই রেনেসাঁ একটি আত্মাহীন ভারসাম্যহীন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। এটাই হচ্ছে সেই চাকচিক্যময় প্রতারক দাজ্জাল (Antichrist) যার আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন নবী-রসুলগণ। এ সত্যটি যত দ্রুত মানুষ হৃদয়ঙ্গম করবে তত দ্রুতই তারা পরবর্তী রেনেসাঁর অভিমুখে যাত্রা করতে পারবে। আসলেই আমাদেরকে একটি নতুন রেনেসাঁ করতে হবে, এই রেনেসাঁ হবে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যাবতীয় অসত্যের বিরুদ্ধে, যাবতীয় স্থবিরতার বিরুদ্ধে। অতীতে ধর্মের বিকৃত রূপগুলো মানুষকে স্থবির করেছিল, এখন করেছে

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ভোগবাদী মতবাদগুলো। ফল একটাই- কান্না, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ ও অসহায়ত্ব।

এই যে সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি, যুদ্ধ, সংঘাত মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, তারা এসব থেকে কিছুতেই বের হতে পারছে না। বহু সীমিত ভূখণ্ডের দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে মানুষ প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে আইন, নীতি-নৈতিকতা ধর্ম সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলছে। এখনও কি শিক্ষিত সমাজ এই সঙ্কটটি উপলব্ধি করবেন না? যারা ঘরের কাছেই নিপীড়িত জনতার চিৎকার শুনে না, শুনলেও নিজেদের ধারণকৃত ব্যবস্থার জালে অসহায় বন্দীর মত চেয়ে থাকতে বাধ্য, কিছু করতে অক্ষম, যারা পাশের বাড়ির মানুষের চিৎকার শুনে না, এরা বধির, এরা মৃত। মানবসভ্যতাকে এই স্থবিরতা থেকে, মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্যই একদিন রেনেসাঁ হয়েছিল। সেই মানুষগুলো পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ ছিল, কিন্তু এখনকার মানুষ সক্রিয়ভাবে পরিবর্তনও চায় না। তাদের চেতনা নেই, বোধ শক্তি নেই। খাচ্ছে দাচ্ছে টিভি দেখছে যেন সব কিছু স্বাভাবিক আছে।

প্রগতি অতীতকে অস্বীকার করে না, অতীতে ফিরেও যায় না। সে অতীতকে মূল্যায়ন করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সময়ের পরিবর্তনে মানুষের মননশীলতার সঙ্গে মানানসই, কালের প্রয়োজন পূরণ করার মত ব্যবস্থা নিয়েই যুগে যুগে নবী-রসুলদের আগমন হয়েছে। না হলে একজন নবী দিয়েই কাজ চলত। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল এসেছেন মানুষকে প্রগতির শিক্ষা দেয়ার জন্য, মানুষকে পিছনে ফেরানোর জন্য নয়। কিন্তু এখন আমরা পেছন দিকে হাঁটছি। আমরা অহঙ্কার করি আদিম সমাজে নাকি জোর যার মুল্লুক তার ছিল। এখনকার কথিত আধুনিক প্রগতিশীল সমাজে মুল্লুক কার? সেই শক্তিমানেরই। সুতরাং আমরা তো অতীতেই ফিরে গেছি। আধুনিক সভ্যতা উঁচু উঁচু দালানকোঠার অহঙ্কার করছে। এমন উঁচু উঁচু স্থাপনা অতীতের অনেক সভ্যতাই বানিয়েছিল। পিরামিড বানিয়েছিল, ঝুলন্ত বাগান বানিয়েছিল। সেই সব উঁচু স্থাপনা অভিশাপ হলো কেন, পর্যটকদের দর্শনীয় পরিত্যক্ত স্থান হলো কেন? কারণ উন্নতি প্রগতি যখন অহঙ্কারের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তখন তা অভিশাপে পরিণত হয়। এই আধুনিক সভ্যতার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অহঙ্কারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাবধান মোহগ্রস্ত পশ্চিমপূজারীরা! অতীত থেকে শিখুন।

আজকে যারা ইসলামের নামে বিভিন্ন প্রকার উন্মাদনা সৃষ্টি করছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাচ্ছে, অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড করছে, মানুষের জ্ঞানসাধনায়, মুক্তচিন্তায় ও বাকস্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সহাবস্থানের পরিবেশ বিনষ্ট করছে, জঙ্গিবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে তাদের জ্ঞাতার্থে একটি কথা বলতে হয়- চৌদ্দশত বছর আগে আল্লাহ যে ইসলামটি পাঠিয়েছিলেন সেই ইসলাম কিন্তু কোনো জ্ঞানবিমুখ, অজ্ঞতাপূজারী, উন্মাদনাপ্রবণ বর্বর জাতি সৃষ্টি

করে নি, বরং এমন একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল যার কাছে আধুনিক যুগ এমন কি ইউরোপে সংঘটিত রেনেসাঁও ঋণ স্বীকার করে থাকে।

ইউরোপের রেনেসাঁর আগের রেনেসাঁটি ঘটিয়েছিলেন আল্লাহর শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.)। তিনি আরব জাতিকে জাহেলিয়াতের বন্দীদশা, কূপমণ্ডূকতা থেকে এমন এক হ্যাঁচকা টানে বের করে আনলেন যে সেই অশিক্ষিত মূর্খ আরবরা জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হলো। এর শুরুটা কীভাবে হলো?

পবিত্র কোর'আনে অবতীর্ণ প্রথম শব্দটিই হলো একটি আদেশ- ইক্‌রা (সুরা আলাক: ০১)। কোরআনের আরো বহু জায়গায় বলা হয়েছে, দেখ, জান, চিন্তা কর, অনুধাবন কর (সুরা সোয়াদ : ২৯; সুরা আনকাবুত : ৪৩; সুরা জুমার : ৯ ইত্যাদি)। সেই অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবদেরকে বলা হচ্ছে জানতে, বলা হচ্ছে চিন্তা করতে, গবেষণা করতে, অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাদের মস্তিষ্ককে ব্যবহার করতে তাগিদ করা হচ্ছে। আল্লাহর রসুল তাদের চিন্তাজগতে জাগরণ, রেনেসাঁ সৃষ্টি করে দিলেন। প্রথমে শতধাবিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীটি ইস্পাতের মতো ঐক্যবদ্ধ হলো। তারা ইতোপূর্বে যাপিত তাদের উদ্দেশ্যহীন জীবনের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছালো এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদের সমস্ত জীবন-সম্পদকে উৎসর্গ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তাদের আকিদা (Comprehensive Concept) সুস্পষ্ট হয়ে গেল। তাদের চিন্তাজগতের বন্ধ দুয়ারগুলোর তালা একে একে ভাঙতে শুরু করল। সামরিক শক্তিতে তারা ছিলেন অপরাজেয়, রোমান পারস্যের মতো হাজার বছরের পুরনো শক্তিও তাদের সামনে শুকনো পাতার মতো উড়ে গিয়েছিল। উরাল পর্বত, কারাকোরাম, কিরঘিজ, পিরোনিজ পর্বতের শিখরে তাদের পতাকা উড়ল। সেই আরবজাতি যারা কিছুদিন আগেও ছিল চিন্তাহীন, অথর্ব, চুরি-ডাকাতি আর কামড়া-কামড়িতে ব্যস্ত, ছিল অন্যায়কারী, অন্যায়ের সাথে আপসকারী ভীরু কাপুরুষ, তাদেরকে আল্লাহর রসুল দুঃসাহসী যোদ্ধা ও অর্ধ দুনিয়ার শাসক জাতিতে পরিণত করলেন, তারাই বিশ্বের বুকে সবচেয়ে আলোকিত, মহিমান্বিত, সমৃদ্ধ জাতিরূপে আবির্ভূত হলো। ইতোপূর্বে তারা ধর্ম বলতে বুঝত কাঠ পাথরের মূর্তিপূজা আর মন্ত্রপাঠ। অর্থাৎ সংকীর্ণ গণ্ডিতে, স্থবির জড়বস্তুর মধ্যে মানুষের অপার চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট, আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এই প্রচণ্ড গতিময়তা যখন জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হলো তার ফলে কিছুদিন পরেই জাতিটির সদস্যরা রসায়ন, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রযুক্তি, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অন্যান্য সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন, গ্রীক, রোমান, ভারতীয়, পারসিক সভ্যতার পুস্তকগুলো গবেষণা করে নিজ ভাষায় অনুবাদ করলেন এবং জ্ঞান

বিজ্ঞানের চাকাকে প্রচণ্ড গতিতে ঘুর্ণিত করে দিলেন। তারা নিজেরা আরো হাজার হাজার মহামূল্যবান বই রচনা করলেন। বহু নতুন অজানা দেশ আবিষ্কার করলেন।

মানবজীবন প্রচণ্ড গতিময়, ধর্মও যদি তদ্রূপ গতিময় না হয় তাহলে তা পরিত্যক্ত হবেই, মানুষ তা বেশিদিন বহন করতে পারবে না, এটা প্রাকৃতিক। রসুলাল্লাহ (সা.) তাদেরকে কী ধর্ম শেখালেন? না, স্থবির উপাসনা নয় বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচারী শাসকের জুলুম থেকে রক্ষা করা, ন্যায়ের স্থাপনা করা, এটাই তোমাদের ধর্ম, এটাই তোমাদের এবাদত। শেখালেন দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই আরবরা নিজেদের সুপ্তসত্তাকে জাগ্রত করলেন, অনুভব করলেন তাদের মধ্যে অপার সম্ভাবনা লুকায়িত আছে। তারা নিজেদেরকে নতুনরূপে আবিষ্কার করলেন, বিশ্বের ইতিহাসকে পাল্টে দিলেন। আরবজাতির এ নবজাগরণ সম্বন্ধে, স্থবিরতার পরিবর্তে আলোড়ন সৃষ্টির নেপথ্য কারণ বলতে গিয়ে ইতিহাসবেত্তা Lothrop লিখেছেন- Forgetting the chronic rivalries and blood feuds which had consumed their energies is internecine strife, and welded into a glowing unity by the fire of their new found faith, the Arabs poured forth from their deserts to conquer the earth for Allah the One true God (The New World of Islam- Lothrop). অর্থাৎ "যে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পুরুষাণুক্রমিক রক্তাক্ত বিবাদের দরুন ও আত্মকলহে তাদের শক্তি নিঃশেষ হচ্ছিল তা ভুলে যেয়ে এবং নতুন বিশ্বাসের আগুনে উজ্জ্বল ঐক্যে দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে আরবরা তাদের মরুভূমি থেকে বানের ঢলের মত নির্গত হলো- এক এবং সত্য অল্লাহর জন্য পৃথিবী জয় করতে।" কথা হলো, রসুলাল্লাহর সৃষ্ট এই রেনেসাঁ কিন্তু ইউরোপীয় রেনেসাঁর মতো আত্মাহীন, ভারসাম্যহীন, কেবল বস্তুতান্ত্রিক ছিল না। সেটা ছিল শরিয়াহ ও মারেফাত তথা দেহ-আত্মা, দুনিয়া-আখেরাতের ধারণার সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) সভ্যতা। যে সভ্যতা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছিল, সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, কিন্তু পুঁজিবাদের শোষণ সেখানে ছিল না, অধিকাংশ মানুষ নৈতিক মূল্যবোধে, আত্মিক মানবিক গুণাবলীতে আলোকিত মানুষে পরিণত হয়েছিল। কালেভদ্রে কেউ অপরাধ করলে নিজে গিয়ে আদালতে নিজের প্রায়শ্চিত্তের জন্য শাস্তি কামনা করত, তাকে ধরে আনার জন্য পুলিশ গোয়েন্দাবাহিনী কিছুই প্রয়োজন পড়ত না। অর্থাৎ মানুষের ভেতরে বাইরে আমূল পরিবর্তন করল। এটাই হলো প্রকৃত বিপ্লব, প্রকৃত রেনেসাঁ। সেই যে রেনেসাঁ সৃষ্টি করে দিলেন রসুলাল্লাহ সেটার ধাক্কা কয়েক শতাব্দী চলল। সে রেনেসাঁর ঢেউ পরবর্তীতে ইউরোপের তটভূমিতে আছড়ে পড়ল।

এরই মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেল অর্ধ সহস্রাব্দ। এই সুদীর্ঘ সময়ে এ উম্মাহর অনুসৃত জীবনব্যবস্থার (দীন) ভারসাম্য নষ্ট হলো, আকিদা-লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো, রাজা

বাদশাহরা ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গেল, একদিকে ভারসাম্যহীন সুফিবাদ জাতির সংগ্রামী বহির্মুখী চরিত্রকে অন্তর্মুখী করে দিল, গতিশীল জাতিকে স্থবির করে দিল; অপরদিকে আলেম মুজতাহিদ, মোফাসসেররা দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েল উদ্ভাবন করে জাতিকে বহু ফেরকা, মাজহাবে বিভক্ত করে ফেলল এবং সহজ সরল দীনকে এমনভাবে মাকড়সার জালের ন্যায় জটিল ও দুর্বোধ্য করে ফেলল যে তা সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে চলে গেল। দীনের ভারসাম্য নষ্ট হল। ইহজীবনে মানুষকে সকল অন্যায় থেকে মুক্তি দেওয়াই হচ্ছে পরকালীন মুক্তির পূর্বশর্ত- এই ভারসাম্যটি তারা ভুলে গেলেন। ভারসাম্য হারানোর ফলে জাতিকে পঙ্গুত্ব পেয়ে বসল, তারা অন্তর্মুখী জড় ও মহাস্থবির হয়ে গেল। তারপর থেকে তাদের উপর আবার গজব শুরু হলো যা এখনও চলছে যা অন্যত্র বলা হয়েছে।

আজ আমরা কোন ধর্ম পালন করছি? উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে সেই ঝড়ের ন্যায় গতি সৃষ্টি করেছিল যে ধর্ম, যে ইসলাম সেটা আজ কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। এ যুগের ধর্মান্ধ, কূপমণ্ডূকদের বুঝতে হবে তাদের ধারণ করে রাখা অযৌক্তিক, শুধুমাত্র পরকালনির্ভর, সওয়াবনির্ভর, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পূর্ণ, বিজ্ঞানবিদ্বেষী, প্রগতিবিমুখ, জবরদস্তিকারী, পুরুষতান্ত্রিক ও নারী নিগ্রহকারী ধ্যান-ধারণা আর মানবজাতির কাছে গৃহীত হবে না। সেটা বহু শত বছর আগেই আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। কখন আবেদন হারিয়েছে সেটাও সকলের জানার প্রয়োজন আছে। যখন মানবজাতি দুর্ভোগে নিমজ্জিত হয়েছিল, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকায় চলছিল দাসত্ব ব্যবস্থার নিষ্পেষণ, ইউরোপে চলছিল মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও ইনকুইজিশান, রাশিয়ায় চলছিল জারতন্ত্রের দুঃশাসন, পৃথিবীর পূর্ব দিক চীন সাম্রাজ্যে চলছিল মানুষের বঞ্চনা, দুঃখ। তখন ধর্মগুলো কী করছিল, মুসলিমরা কী করছিল? তারা তো সেই অন্যায় অবিচারের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে ছুটে যায় নি। তাদের কাছে সেই মহান আদর্শ ছিল যা দিয়ে তারা তখন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেছিল। কিন্তু তাদের শাসকরা ছিল ভোগবিলাসে নিমগ্ন, তাদের আলেমরা ছিল ফেকাহ আর তাফসির নিয়ে ফতোয়বাজির গবেষণায় নিবিষ্ট, তাদের সুফিবাদীরা ছিলেন আরো উত্তম পরহেজগার বান্দা হওয়ার সাধনায় আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। ধার্মিকরা নিজেদেরকে মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডার আর খানকার চার দেওয়ালে বন্দী করে রেখেছিল, সেখানে বসে বসে তসবিহ, জপমালা, রোজারিও টিপছিল। তারা একটিবার মাথা তুলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে নি। তারা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের অবসান, এক কথায় সামগ্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য কোথাও ছুটে যায়

নি। অথচ মানুষ মুক্তির নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিল, তারা বিক্ষিপ্তভাবে জীবন দিয়ে যাচ্ছিল মুক্তির সংগ্রামে।

তাদের জন্য এগিয়ে এসেছেন ডেকার্ট, স্পিনোজা, আব্রাহাম লিঙ্কন, কার্ল মার্কস, লেনিন, চে গুয়েভারা, মাও সে তুং। তারা মানুষকে সংগঠিত করেছেন, তাদেরকে জাগিয়ে তুলেছেন বিপ্লবের মন্ত্রে। বক্তব্য দিয়েছেন, মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, যেহেতু তাদের পথ মানবমস্তিষ্কপ্রসূত ছিল বিধায় সেগুলো ভুল পথ ছিল যা পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে পরিবর্তন করা। মানুষ একটি বিকল্প খুঁজেছিল, সেটা তারা পেয়ে গিয়েছিল ঐ দার্শনিক ও বিপ্লবীদের কাছে। সময় তো আর থেকে থাকে না। ধর্ম যখন মানুষের সমাধান দিতে পারল না তখন ঐ নতুন নতুন দর্শনগুলোকেই মানুষ আলিঙ্গন করে নিল, সাম্যবাদ, গণতন্ত্রকেই তারা গ্রহণ করে নিল। তারা সাড়ে ছয় হাজার মাইল দুর্গম পথ মাও সেতুং- এর সাথে পাড়ি দিল, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব ঘটালো। বর্ণবাদ বিলোপের পর নিগৃহীত কালো মানুষেরা আব্রাহাম লিংকনকেই ত্রাতা-দেবতা হিসাবে গ্রহণ করে নিল। সেই দিনই ধর্ম মানুষের কাছে আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। এখন ধর্মগুলো পরকালীন পুরস্কার ও সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপাসনালয়ের গণ্ডিতে কোনোমতে টিকে আছে। সেগুলো মানবজীবনের কোনো বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান দিতে পারছে না, বরং সেগুলো বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রে এসে বিবিধপ্রকার সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করছে। ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মব্যবসা, ধর্মবিদ্বেষ ইত্যাদি। সুতরাং সেই উপাসনালয় ও আনুষ্ঠানিকতাকেন্দ্রিক, লেবাস ও বিশ্বাসসর্বস্ব সেই ভারসাম্যহীন ধর্মগুলো যুক্তিবোধসম্পন্ন চিন্তাশীল মানবসমাজে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। কারণ চূড়ান্ত বিচারে মানুষ যুক্তিশীল প্রাণী, তারা সাময়িক হুজুগে চালিত হলেও সেটা স্থায়ী হতে পারে না। যুক্তির বাহিরে মানুষ কোনো কাজ বেশি দিন করে না। এই জন্য প্রকৃত ইসলাম যুক্তির কথা বলে, আর বর্তমানের বিকৃত ইসলাম এই যুক্তির বিরুদ্ধে কট্টর অবস্থান নিয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে আবারো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে একটা মানবিক সভ্যতার অভ্যুত্থানের যেখানে শক্তির রাজত্ব থাকবে না, থাকবে সত্যের রাজত্ব, ন্যায়ের রাজত্ব। যেখানে মানুষ কথা বলতে পারবে মুক্তভাবে, ভাবতে পারবে মুক্তভাবে। সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ অবাধে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে পারবে, যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারবে। অধিকারের দাবিতে কাউকে আর রক্ত দিতে হবে না। এখন এই অচলায়তনকে প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে ফেলা সাধারণ মানুষেরই কাজ নয়, এবং বিশেষ করে এ যুগের সকল শিল্পি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল,

সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের কাজ। তারাই সাধারণ মানুষের চিন্তার দুয়ারে এই বজ্রাঘাতটি করবেন যেন তারা মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এই কাজটি করার জন্য যে আদর্শটি প্রয়োজন তা আল্লাহ্ দয়া করে হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। যারা আল্লাহর দান বলে একে মানতে আপত্তি করবেন তাদেরকে আর বলার কিছু নেই। তবে সত্য হলো, যেভাবেই বলা হোক না কেন, আমাদের কাছে সেই আদর্শ আছে এবং সেটা নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি। আমরা চেষ্টা করছি আবারও একটি রেনেসাঁ, নবজাগরণের সূচনা করতে, মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটাতে। বুদ্ধি, চিন্তা, আত্মা, দৃষ্টি, বিবেক খুলে দিতে। মানুষকে তার সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করছি যেন সে জেগে ওঠে, যেন সে এই গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার পথ সন্ধান করে। এই সন্ধানের মধ্যেই নিহিত আছে রেনেসাঁর নিশ্চয়তা। সেই রেসোঁর ভিত্তি হবে আল্লাহর হুকুমের উপর যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্য, এটাই তওহীদের মূল ঘোষণা।

হেযবুত তওহীদ (Hezbut Tawheed) এর সংঘ স্মারক

ধারা-১) নামঃ

এই আন্দোলন 'হেযবুত তওহীদ' (Hezbut tawheed) নামে অভিহিত হবে। আরবিতে 'হিজব' শব্দের অর্থ হলো দল আর 'তওহীদ' অর্থ হলো একত্ববাদ। তওহীদ শব্দটি ওয়াহদানিয়াত শব্দ থেকে এসেছে। ওয়াহদানিয়াত অর্থ একত্ব। অর্থাৎ হেযবুত তওহীদ অর্থ আল্লাহর একত্ববাদের দল বা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দল। তওহীদের মূল কথা হচ্ছে, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো হুকুম না মানা। কেননা আল্লাহ হচ্ছেন সমস্ত ন্যায়, হক আর সত্যের উৎস, ধারক। যাবতীয় ন্যায় আর সত্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। সুতরাং হেযবুত তওহীদ হচ্ছে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর হুকুম তথা ন্যায় ও সত্যের পক্ষ অবলম্বনকারী দল।

ধারা-২) প্রতিষ্ঠাতাঃ

মহামান্য এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হেযবুত তওহীদ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ পবিত্র শবে বরাতে টাঙ্গাইলের করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার পন্নী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ধারা-৩) প্রতিষ্ঠাকাল ও স্থানঃ

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ খ্রি.; দাউদ মহল, গ্রামঃ করটিয়া, থানা ও জেলাঃ টাঙ্গাইল।

ধারা-৪) এমামঃ

হেযবুত তওহীদের প্রধান অর্থাৎ সর্বোচ্চ নেতা 'এমাম' অভিধায় অভিহিত হবেন। এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর ইন্তেকালের পর থেকে আন্দোলনের এমাম অর্থাৎ সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন এমামুয্যামানের আদর্শের উত্তরসূরি জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। তিনি ১৯৭২ সালে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার পোরকরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ধারা-৫) প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানাঃ

বাসা - ৩, রোড ২০/এ, সেক্টর ১৪, উত্তরা, ঢাকা।

ঢাকা মহানগরীর যেকোন স্থানে প্রধান/কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন এবং যেকোন স্থানে স্থানান্তর করা যাবে।

ধারা-৬) কার্যক্রমের আওতাভুক্ত এলাকাঃ

হেযবুত তওহীদের কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত। যেহেতু হেযবুত তওহীদ মানবজাতির সামনে মুক্তির প্রকৃত পথ তুলে ধরছে, তাই তাত্ত্বিকভাবে যেখানে মানুষের বসবাস আছে সেখানেই হেযবুত তওহীদের কর্মক্ষেত্র হওয়ার দাবি রাখে। হেযবুত তওহীদের বেশ কিছু সদস্য কর্মসূত্রে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন, তারাও ঐক্যবদ্ধ থেকে তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে হেযবুত তওহীদের বক্তব্যগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরছেন।

ধারা-৭) প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থাঃ

হেযবুত তওহীদ মানবতার কল্যাণে নিবেদিত একটি জনকল্যাণমূলক অরাজনৈতিক জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন। এ আন্দোলন দেশের প্রচলিত সকল আইন-কানুন বিধি-বিধান মেনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। আন্দোলন কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রমের দায়ভার আন্দোলনই বহন করবে।

ধারা-৮) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

মানবজাতির অশান্তির মূল কারণ বর্তমান বস্তুবাদী দাজ্জালীয় সভ্যতার জীবনদর্শনের পরিবর্তে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের উপর, ন্যায়ের পক্ষে, ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অপরাজনীতিসহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা, এক কথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা।

ধারা-৯) মূলনীতিঃ

(ক) হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করবে মানবতার কল্যাণে আল্লাহর রসুলের গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে।

(খ) হেযবুত তওহীদের কোনো গোপন কার্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য এবং দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

(গ) হেযবুত তওহীদের যেকোন স্তরের সদস্য দেশে প্রচলিত কোনো আইন ভঙ্গ করবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না। কেউ আইন ভঙ্গ বা অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে গেলে তাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

(ঘ) হেযবুত তওহীদের সদস্য বা সমর্থক নয় এমন কারো কাছ থেকে আন্দোলন পরিচালনার জন্য কোনো ধরনের অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

(ঙ) হেযবুত তওহীদের কোনো সদস্য কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

(চ) কর্মক্ষম কেউ বেকার না থেকে হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করবে।

(ছ) দীনের কাজ করে কোনো বিনিময় গ্রহণ করবে না।

ধারা-১০) কর্মসূচি: (কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেখুন পরিশিষ্ট অংশে)

মানবজীবন থেকে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ রক্তপাত এক কথায় যাবতীয় অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলকে যে কর্মসূচি দান করেছিলেন এবং আল্লাহর রসুল ও তাঁর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী যে কর্মসূচি অনুসরণ করেছিলেন সেই পাঁচ দফা কর্মসূচি অনুসরণ করেই হেযবুত তওহীদ সত্যদীন, দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ৫ দফা কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বলেছিলেন– "আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি-

১. **(সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে) ঐক্যবদ্ধ হও।**

২. **(যিনি নেতা হবেন তার আদেশ) শোন।**

৩. **(নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।**

৪. **হিজরত (অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ) করো।**

৫. **(এই দীনুল হককে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় সর্বাত্মক সংগ্রাম করো।**

যে ব্যক্তি এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হলো, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেললো- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের দিকে আহ্বান করল, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামাজ পড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে" [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

এই পাঁচ দফা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ থেকে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে-

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বোধ, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মাদক, অপরাজনীতিবিরোধী চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভা-সমাবেশ, র‌্যালি, পত্রিকা/পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠা, চ্যারিটি শো' প্রদর্শন, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও

প্রজেক্টর/পিডিভিডি'র (পোর্টেবল ডিজিটাল ভিডিও ডিভাইস) মাধ্যমে প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা।

(আ) আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল, কলেজ, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(ই) অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানবগোষ্ঠীকে উন্নত পদ্ধিতিতে সেবামূলক প্রশিক্ষণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা ও ডিপ্লোমা প্রদান করা।

(ঈ) দুষ্প্রাপ্য/পুরাতন পাণ্ডুলিপি/দেশের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া লোকগীতিসহ পুঁথি সংগ্রহ এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

(উ) সাধারণ মানুষের (শিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত) মধ্যে পাঠাগার/পাঠকক্ষ প্রতিষ্ঠা করে পাঠভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেতন করা এবং সে লক্ষ্যে বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশনালয় স্থাপন করা।

(ঊ) নারী-পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা এবং প্রচার, মবিলাইজেশন ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সকল প্রকার নাগরিক সু-উদ্যোগকে সহায়তা দান, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি।

(ঋ) সত্য প্রচার ও প্রসার, সুকুমার বৃত্তি জাগ্রত করা এবং সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে হেযবুত তওহীদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে। যেমন প্রকাশনা সংস্থা, দৈনিক পত্রিকা, মিডিয়া হাউজ, অনলাইন টেলিভিশন, অনলাইন পত্রিকা, ক্রীড়া সংস্থা, সাংস্কৃতিক দল ইত্যাদি। সময়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন হলে এমাম/চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে আরো বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা যাবে।

(এ) দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থসেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল নির্মাণ করা।

ধারা-১১) প্রতীক: (প্রতীকের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেখুন পরিশিষ্ট অংশে)

হেযবুত তওহীদের প্রতীকের মূল আকৃতিটি পবিত্র ক্বাবা শরীফের আদলে অঙ্কিত

যার অভ্যন্তরে পবিত্র রওজার গম্বুজ ও পবিত্র কোর'আন রয়েছে। নিচে রয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম নবী করিম (সা.) করেছেন তার প্রতীক তলোয়ার। মাননীয় এমামুয্যামান যখন কলেজে পড়েন তখন তিনি একটি স্বপ্নে ক্বাবা শরীফের ভেতর ও বাহিরের দৃশ্য দেখেছিলেন। তিনি সেই স্বপ্নের দৃশ্যপটের সাথে মিলিয়ে হেযবুত তওহীদের প্রতীকটি অঙ্কন করেছিলেন। এর মধ্যে পাঁচটি অংশ রয়েছে যা কর্মসূচির পাঁচটি দফাকে তুলে ধরে।

সেই পাঁচটি অংশ হচ্ছে কাবা শরিফ, রওজা মোবারক, কোর'আন, হেযবুত তওহীদ ও তরবারি।

ধারা-১২) আয়-ব্যয়ঃ

আন্দোলনের সদস্য-সদস্যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে অর্থ দান করেন সেটাই হবে আন্দোলনের আয়ের মূল উৎস। আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী বিক্রয়লব্ধ লভ্যাংশও আয়ের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও আন্দোলন যদি কোনো ব্যবসায় বা অংশীদারী কারবারে বিনিয়োগ করে তাহলে সেখান থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ আন্দোলনের আয় হিসাবে গণ্য হবে।

আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে প্রকাশনা দ্রব্য মুদ্রণ বাবদ এবং বিভিন্ন সময়ে গৃহীত কর্মসূচি যথা সভা, সেমিনার, সমাবেশ, র‌্যালি, ঘরোয়া বৈঠক ইত্যাদি আয়োজনের জন্য এমামের অনুমোদনক্রমে অর্থ ব্যয় করা হবে।

হেযবুত তওহীদের আয় হতে উহার যেকোন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, নির্বাহী প্রশাসনিক, আন্দোলনের অগ্রগতিসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাজে ব্যয় করা যাবে। কোনো আয় কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সদস্যদের মধ্যে লাভ বা বোনাস আকারে বণ্টন করা যাবে না এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে বেতন/ভাতা প্রদান করা যাবে না।

অর্থ সংগ্রহের খাতসমূহঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মো'মেন হওয়ার শর্ত হিসাবে দুটো জিনিস দাবি করেছেন - জীবন এবং সম্পদ। মানবসমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সম্পদ যেন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পুঞ্জিভূত হতে না পারে এবং একটি গোষ্ঠীর মধ্যে আবর্তিত না হতে পারে, সম্পদ যেন কোথাও অলস পড়ে না থেকে সর্বদা উৎপাদনশীল থাকে, গতিশীল থাকে সেজন্য আল্লাহ সম্পদকে সমাজের মধ্যে সর্বদা দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে সঞ্চালিত করার জন্য বহুবিধ নির্দেশনা ও পদ্ধতি দান করেছেন। ধনীর সম্পদের মধ্যে দরিদ্রের অধিকার একটি প্রাকৃতিক অধিকার। মো'মেন আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানুষের কল্যাণে অর্জিত সম্পদ দান করবে। এতে একসাথে দুটো কাজ হবে - একদিকে তার আত্মা পরিশুদ্ধ হবে, অন্যদিকে সমাজ উপকৃত হবে।

সত্য প্রতিষ্ঠায় শ্রমের পাশাপাশি অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। হেযবুত তওহীদ যেহেতু মানবতার কল্যাণে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত, কাজেই এ আন্দোলনের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য সদস্যদের স্বতঃপ্রণোদিত শ্রমের যেমন প্রয়োজন তেমনি স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অর্থেরও প্রয়োজন। আন্দোলনের বিবিধ কার্যাবলী যেমন পুস্তক, পত্রিকা প্রকাশ, সভা-সেমিনার ইত্যাদি এবং দরিদ্র, বিপদগ্রস্ত, প্রতিপক্ষের দ্বারা হয়রানির শিকার হওয়া সদস্যদের সহযোগিতা করার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হয়। মাননীয় এমামুয্যামান আন্দোলন প্রতিষ্ঠার ক্ষণেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যারা

এ আন্দোলনের সাথে আন্তরিকভাবে ঐক্যবদ্ধ নয় তাদের থেকে আমরা কোনো অর্থ গ্রহণ করব না।

আল্লাহর পথে তথা মানবতার কল্যাণে সংগ্রামে ব্যয়ঃ আন্দোলনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সদস্য-সদস্যাদের প্রদত্ত অর্থ 'সাধারণ তহবিল' হিসেবে গৃহীত হবে।

করজে হাসানাঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আন্দোলনকে যেকোন সদস্য বিনা সুদে ঋণ প্রদান করতে পারবেন।

যাকাতঃ যার নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকবে সে যাকাতের সম্পূর্ণ অংশ বা আংশিক পরিমাণ অর্থ আন্দোলনের তহবিলে প্রদান করতে পারবেন।

কাফফারাঃ সওম বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে কিংবা আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোনো কাজ করে অনুতপ্ত হলে কাফফারাস্বরূপ আন্দোলনের তহবিলে অর্থ প্রদান করতে পারবেন।

ফেতরাঃ ধনী-গরীব সকলে যেন ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে ঈদুল ফিতরের সময় প্রত্যেক সক্ষম সদস্য-সদস্যা নির্ধারিত অর্থ আন্দোলনের তহবিলে প্রদান করতে পারবেন, যা কেবল দরীদ্রদের মধ্যে বিলি-বন্টন করা যাবে।।

সদকায়ে জারিয়াঃ আন্দোলনের বিশেষ কোনো কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের জন্য অর্থ প্রদান করাকে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে গণ্য করা হবে। 'সদকা' শব্দের অর্থ দান করা এবং 'জারিয়া' অর্থ প্রবহমান, সদাস্থায়ী প্রভৃতি। সদকায়ে জারিয়া হলো এমন দান যার কার্যকারিতা কখনো শেষ হবে না এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

উশরঃ কৃষিজাত পণ্য-ফল ও ফসলের যাকাতকে ইসলামী পরিভাষায় 'উশর' বলা হয়। যে জমিতে সেচ-সার, কীটনাশক ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক উপায়ে ফসল উৎপাদিত হয় তার উশর ফসলের দশভাগের এক ভাগ। কিন্তু যে জমিতে সেচ-সার, কীটনাশক প্রয়োগ প্রভৃতির জন্য আর্থিক ব্যয় সাপেক্ষে ফসল উৎপাদিত হয় তার উশর ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ। যাদের জন্য এ বিষয়টি প্রযোজ্য তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মানবতার কল্যাণে তাদের নেসাব পরিমাণ উশর কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রদান করতে পারবেন।

ফেদিয়াঃ বার্ধক্যজনিত বা অসুস্থতার কারণে সওম না রাখতে পারলে বা অন্য কোনো আমল করতে না পারলে অন্য কাউকে সেই আমল করার জন্য অর্থ প্রদান করাকে ফেদিয়া বলে। এই অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অর্থ সম্পাদকের

কাছেও জমা দিতে পারেন অথবা ব্যক্তিগতভাবেও কোনো দরিদ্র সদস্যকে দিতে পারেন।

মানতঃ আল্লাহ কোর'আনে বলেছেন, 'তারা যেন তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে।' যেকোন সৎ ইচ্ছা পূরণের জন্য মানত করলে সেই অর্থ আন্দোলনে দান করবে বা মানত অনুযায়ী ব্যয় করবে।

ওয়াকফ বা অসিয়তঃ কেউ যদি তার কোনো সম্পদ আন্দোলনকে অসিয়ত করে যান তাহলে তার ওয়ারিশগণ কর্তৃক সেই সম্পদ আন্দোলনের কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, আন্দোলনের ফান্ডসমূহ নির্দিষ্ট খাতেই জমা হয়। যে সদস্য যে খাতের নাম উল্লেখ করে দান করবেন তার অর্থ সেই খাতেই ব্যয় করতে হবে।

হেযবুত তওহীদ (Hezbut Tawheed) এর গঠনতন্ত্র

ধারা-১৩) নামঃ

(ক) বাংলায়ঃ হেযবুত তওহীদ

(খ) ইংরেজিতেঃ Hezbut Tawheed

ধারা-১৪) গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঃ

(ক) হেযবুত তওহীদ বলতে মানবতার কল্যাণে নিবেদিত একটি জনকল্যাণমূলক অরাজনৈতিক জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন বোঝাবে।

(খ) আন্দোলনের ইংরেজি নাম বলতে Hezbut Tawheed বোঝাবে এবং ইংরেজিতে Hezbut Tawheed বলা ও লেখা যাবে।

(গ) সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র বলতে হেযবুত তওহীদের সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্রকে বোঝাবে।

(ঘ) সক্রিয় সদস্য (মোজাহেদ/মোজাহেদা) বলতে হেযবুত তওহীদের যেকোন স্তরের সক্রিয় সদস্যকে বোঝাবে।

(ঙ) প্রাথমিক সদস্য বলতে হেযবুত তওহীদের যেকোন স্তরের প্রাথমিক সদস্যকে বোঝাবে।

(চ) ঐক্যবদ্ধ সদস্য বলতে হেযবুত তওহীদের যেকোন স্তরের ঐক্যবদ্ধ সদস্যকে বোঝাবে।

(ছ) চেয়ারম্যান/এমাম বলতে হেযবুত তওহীদের চেয়ারম্যান/এমামকে বোঝাবে।

(জ) সাধারণ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদককে বোঝাবে।

(ঝ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদককে বোঝাবে।

(ঞ) সাংগঠনিক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদককে বোঝাবে।

(ট) অর্থ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদককে বোঝাবে।

(ঠ) যুগ্ম অর্থ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম অর্থ সম্পাদককে বোঝাবে।

(ড) সহকারী অর্থ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী অর্থ সম্পাদককে বোঝাবে।

(ঢ) দপ্তর সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদককে বোঝাবে।

(ণ) যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম দপ্তর সম্পাদককে বোঝাবে।

(ত) সহকারী দপ্তর সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী দপ্তর সম্পাদককে বোঝাবে।

(থ) সাহিত্য সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য সম্পাদককে বোঝাবে।

(দ) যুগ্ম সাহিত্য সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাহিত্য সম্পাদককে বোঝাবে।

(ধ) সহকারী সাহিত্য সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাহিত্য সম্পাদককে বোঝাবে।

(ন) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদককে বোঝাবে।

(প) যুগ্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদককে বোঝাবে।

(ফ) সহকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদককে বোঝাবে।

(ব) ক্রীড়া সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রীড়া সম্পাদককে বোঝাবে।

(ভ) যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদককে বোঝাবে।

(ম) সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী ক্রীড়া সম্পাদককে বোঝাবে।

(কক) আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদককে বোঝাবে।

(কখ) যুগ্ম আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদককে বোঝাবে।

(কগ) সহকারী আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদককে বোঝাবে।

(কঘ) সাংস্কৃতিক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কঙ) যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কচ) সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কছ) তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কজ) যুগ্ম তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কঝ) সহকারী তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কঞ) আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদককে বোঝাবে।

(কট) যুগ্ম আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদককে বোঝাবে।

(কঠ) সহকারী আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদককে বোঝাবে।

(কড) রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কঢ) রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক যুগ্ম সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক যুগ্ম সম্পাদককে বোঝাবে।

(কণ) রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সহকারী সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সহকারী সম্পাদককে বোঝাবে।

(কত) প্রকাশনা সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশনা সম্পাদককে বোঝাবে।

(কথ) যুগ্ম প্রকাশনা সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম প্রকাশনা সম্পাদককে বোঝাবে।

(কদ) সহকারী প্রকাশনা সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী প্রকাশনা সম্পাদককে বোঝাবে।

(কধ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কন) যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কপ) সহকারী মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী মহিলা বিষয়ক সম্পাদককে বোঝাবে।

(কফ) আইন সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির আইন সম্পাদককে বোঝাবে।

(কব) যুগ্ম আইন সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আইন সম্পাদককে বোঝাবে।

(কভ) সহকারী আইন সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী আইন সম্পাদককে বোঝাবে।

(কম) প্রচার সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদককে বোঝাবে।

(খক) যুগ্ম প্রচার সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম প্রচার সম্পাদককে বোঝাবে।

(খখ) সহকারী প্রচার সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী প্রচার সম্পাদককে বোঝাবে।

(খগ) কর্মসংস্থান সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসংস্থান সম্পাদককে বোঝাবে।

(খঘ) যুগ্ম কর্মসংস্থান সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম কর্মসংস্থান সম্পাদককে বোঝাবে।

(খঙ) সহকারী কর্মসংস্থান সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী কর্মসংস্থান সম্পাদককে বোঝাবে।

(খচ) তথ্য সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য সম্পাদককে বোঝাবে।

(খছ) যুগ্ম তথ্য সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম তথ্য সম্পাদককে বোঝাবে।

(খজ) সহকারী তথ্য সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী তথ্য সম্পাদককে বোঝাবে।

(খঝ) স্বাস্থ্য সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য সম্পাদককে বোঝাবে।

(খঞ) যুগ্ম স্বাস্থ্য সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম স্বাস্থ্য সম্পাদককে বোঝাবে।

(খট) সহকারী স্বাস্থ্য সম্পাদক বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী স্বাস্থ্য সম্পাদককে বোঝাবে।

(খঠ) নির্বাহী সদস্য বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্যকে বোঝাবে।

(খড) **বিভাগ:** বিভাগ বলতে কয়েকটি জেলা বা আংশিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত একটি সাংগঠনিক বিভাগকে বোঝাবে। এর একজন দায়িত্বশীল থাকবে।

(খঢ) প্রধান/কেন্দ্রীয় কার্যালয় বলতে হেযবুত তওহীদের চেয়ারম্যান/এমাম কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত কার্যালয়কে বোঝাবে।

(খণ) শাখা কার্যালয় বলতে চেয়ারম্যান/এমাম কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্তরের শাখা কার্যালয়কে বোঝাবে।

(খত) সাব/উপ-কমিটি বলতে যেকোন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন বা যেকোন উদ্দেশ্যে গঠিত সাব/উপ-কমিটিকে বোঝাবে।

(খথ) কেন্দ্রীয় কমিটি বলতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটিকে বোঝাবে।

(খদ) কেন্দ্রীয় কমিটির এমাম/চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থবছর বলতে ০১ জুলাই হতে ৩০ জুন বা ০১ জানুয়ারি হবে ৩১ ডিসেম্বর অথবা পহেলা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র সময়কে বোঝাবে।

(খধ) অঙ্গীকারনামা বলতে হেযবুত তওহীদের বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের পৃথক পৃথক অঙ্গীকারনামা বোঝাবে।

(খন) অঙ্গীকারপত্র বলতে হেযবুত তওহীদের সক্রিয় সদস্যদের অঙ্গীকারপত্রকে বোঝাবে।

(খপ) সম্মতিপত্র বলতে হেযবুত তওহীদের উপদেষ্টাদের সম্মতিপত্রকে বোঝাবে।

(খফ) আহ্বায়ক কমিটি বলতে হেযবুত তওহীদের যেকোন স্তরের আহ্বায়ক কমিটিকে বোঝাবে।

(খব) উপদেষ্টা কমিটি বলতে হেযবুত তওহীদের যেকোন স্তরের উপদেষ্টা কমিটিকে বোঝাবে।

ধারা-১৫) কার্যক্রমসমূহঃ

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে হেযবুত তওহীদ রাষ্ট্রীয় আইন পূর্ণরূপে মান্য করে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মানবজাতিকে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের দিকে, সত্য ও ন্যায়ের দিকে আহ্বান করার জন্য হেযবুত তওহীদ মাননীয় এমামুয্যামানের বক্তব্য ও লেখা সম্বলিত হ্যান্ডবিল, বই, পত্রিকা, প্রামাণ্যচিত্র ইত্যাদি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে আসছে। এরই অংশ হিসাবে আন্দোলনের সদস্য-সদস্যারা বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে, রাস্তাঘাটে ফেরি করে, বই মেলায় স্টল নিয়ে ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে এসব প্রকাশনাসামগ্রী বিক্রয় করে থাকেন। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে শিল্পকলা একাডেমি, পৌর মিলনায়তন, জাতীয় প্রেসক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরির সেমিনার কক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, জাতীয় যাদুঘরের সেমিনার কক্ষ, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তন পর্যন্ত বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতির আয়োজন করে আন্দোলনের বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আন্দোলনের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে তাদেরকে নিয়মিতভাবে অবহিত করা হয় এবং তাদের কাছে প্রকাশনাসমূহ দিয়ে আন্দোলনের বক্তব্য সম্পর্কে অবগত করা হয়। আন্দোলনের নিজস্ব পরিচালনায় প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আন্দোলনের বক্তব্য নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। হেযবুত তওহীদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও আন্দোলনের যাবতীয় প্রকাশনাসমূহ ও কার্যক্রমের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

ধারা-১৬) প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণঃ

মানবতার মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় মন, উত্তম চরিত্র, আত্মিক শক্তি, সবর, লক্ষ্যের

প্রতি অবিচলতা (হানিফ)। সেই চরিত্র হতে হবে প্রধানত পূর্বোক্ত পাঁচ দফা ভিত্তিক অর্থাৎ তাদেরকে হতে হবে ইস্পাতের মতো ঐক্যবদ্ধ, পিঁপড়ার মতো সুশৃঙ্খল, স্রষ্টার প্রতি প্রকৃতির মতো আনুগত্যশীল, সকল মিথ্যা ও অকল্যাণ থেকে হেজরতকারী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক, কঠোর, প্রতিবাদী ও সংগ্রামী। এই চরিত্র অর্জনের জন্য হেযবুত তওহীদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত এবং শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত পদ্ধতিতে সালাহ (নামাজ) কায়েম করা। সালাতের বাইরে হেযবুত তওহীদ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন শরীরচর্চামূলক খেলাকে (যেমন কাবাডি, ফুটবল, সাঁতার) উৎসাহিত করে থাকে।

দীনের কোনো ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই- এটা ইসলামের একটি মূলনীতি। কাজেই আন্দোলনের সদস্যগণ যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মানবতার কল্যাণে তাদের অর্জিত সম্পদ ও মূল্যবান সময় ব্যয় করেন অর্থাৎ সত্য ও হকের পথে আত্মোৎসর্গ করেন সে জন্য যথাসাধ্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর কেতাব থেকে, রসুলাল্লাহ (স.) ও তাঁর উম্মাহর জীবনী থেকে, অন্যান্য নবী রসুলদের জীবনী থেকে এবং মানব ইতিহাসে যে মহান ব্যক্তিগণ দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণে সংগ্রাম করেছেন, আত্মত্যাগ করেছেন তাদের জীবনী থেকেও উদ্বুদ্ধ করা হবে। নিঃস্বার্থ, আত্মোৎসর্গীকৃত কিছু মানুষ ছাড়া একটি মহান সভ্যতা বিনির্মাণ সম্ভব নয়। কাজেই ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলগণ, প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

ধারা-১৭) নারীদের অংশগ্রহণঃ

রসুলাল্লাহর (স.) সময় পুরুষ আসহাবদের পাশাপাশি নারী আসহাবগণও জাতীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রায় সকল কাজে অংশগ্রহণ করেছেন, কোনো কাজেই তারা পিছিয়ে ছিলেন না। জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক অংশকে অনগ্রসর রেখে জাতীয় উন্নয়ন ও মুক্তি সম্ভব নয়। এজন্য হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রায় সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়। আমীরের দায়িত্ব থেকে শুরু করে দাপ্তরিক কাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাজে, হিসাব রক্ষণ বিভাগের কাজে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, সভা, সমাবেশ, সেমিনার, র‌্যালি, মানববন্ধন, এমনকি মাঠে ময়দানে পত্রিকা, বই বিক্রির কাজেও নারীরা অংশগ্রহণ করেন।

সাংগঠনিক অধ্যায়

ধারা-১৮) সদস্যস্তর ও আনুগত্য ধারার বৈশিষ্ট্যঃ

(ক) এমামঃ সাধারণভাবে সমস্ত মানুষই আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ জাতির মধ্যে একজন নেতা থাকতে হয়। এই নেতার আরবি পরিভাষা হচ্ছে এমাম (***Leader***)। ইসলামের আকিদা মোতাবেক সকল মুসলিমই একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাদের কেন্দ্রীয় নেতাও একজন। জাতির মধ্যে যেকোন প্রকার বিভাজন নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেছেন প্রত্যেক কওমকে তার এমামের নাম ধরে ডাকা হবে (সুরা বনী ইসরাইল ৭১)। মুসলিম সমাজের নকশা বা মডেল হচ্ছে সালাহ। যিনি সালাহ কায়েম করান তাকে যেহেতু এমাম বলা হয় তাই মুসলিমদের নেতাকেও এমাম বলা সঙ্গত। তিনি জাতির আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্ব বিষয়ে জাতির নেতৃত্ব দিবেন, শিক্ষা দিবেন, নির্দেশ দিবেন। আন্দোলনের যেকোন বিষয়ে তিনি হবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা।

(খ) আমিরঃ আন্দোলনের যেকোন স্তরের প্রতিটি কমিটির যিনি দায়িত্বশীল থাকবেন তিনিই আমির। ইসলামের বিধান হলো, দুইজন মো'মেন যদি একত্রে থাকে তাহলে শৃঙ্খলার স্বার্থে তাদের মধ্যেও একজনকে আমির বলে মনোনীত করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই মো'মেন নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় থাকতে পারবে না। আমির শব্দটি এসেছে আম্‌র থেকে, আম্‌র অর্থ আদেশ এবং আমির অর্থ আদেশ দানকারী ইংরেজিতে ***Commander***. আল্লাহ বলেছেন, হে মো'মেনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস কর (অর্থাৎ যদি তোমরা নিজেদেরকে মো'মেন বলে দাবি কর), তাহলে আল্লাহর আনুগত্য কর, রসুলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের আদেশদানের অধিকারী অর্থাৎ আমিরের (কোর'আন, সুরা নিসা: ৫৯)। এটি একটি চেইন অব কমান্ড (Chain of command), আল্লাহ, রসুল এবং আমির। **এই চেইন অফ কমান্ডটি একটি সূত্রে গাঁথা, এই চেইনের প্রত্যেকের আদেশের মূল্যই সমান**। তাই হেযবুত তওহীদের সদস্যগণ সর্বাবস্থায় তার আমিরের প্রতিটি হুকুম যথাসাধ্য পালন করবে, আনুগত্য করবে। কখনও যেন এর বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় না হয়। শুধু একটি মাত্র শর্ত আছে যেখানে এই আনুগত্য করবে না, সেটা হলো যদি কখনও আমিরের হুকুম আল্লাহর বা রসুলের হুকুমের বিরোধী হয়। ঐ রকম কোনো হুকুম হলে তা অমান্য করবে এবং তার ঊর্ধ্বতন আমিরকে জানাবে।

আমিরগণ আন্দোলনের নির্দিষ্ট শপথ গ্রহণপূর্বক দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। তিনি আন্দোলনের প্রতিটি নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য থাকবেন। এমামের নির্দেশনা পালন করাই আমীরের কর্তব্য। মাননীয় এমামুয্‌যামান বলেছিলেন, আমির যেমন

হবে মোজাহেদ তেমন হবে। আমির যদি ভীরু কাপুরুষ কৃপণ বিশৃঙ্খল হয় মোজাহেদরাও অবচেতনভাবেই তেমন চরিত্রের হবে। আমির হবে মোজাহেদদের জন্য ঢালস্বরূপ। এজন্য আমিরগণ তার অধীন সদস্যদের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতায় হবেন কুসুমের মতো কোমল, অপরদিকে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে হবেন লোহার মতো কঠিন।

(গ) সদস্যঃ

- **সক্রিয় সদস্য (মোজাহেদ / মোজাহেদা):** যারা আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে ও যেকোন সঙ্কটে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে, আন্দোলনের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে, নেতার আনুগত্যে অটল থাকতে, নিজেদেরকে যাবতীয় শেরক, কুফর, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা থেকে পবিত্র রাখতে এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন ও সম্পদ মানবতার কল্যাণে ব্যয় করতে নির্ধারিত অঙ্গীকারপত্র পূরণ করে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছেন তারাই সক্রিয় সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।
- **প্রাথমিক সদস্যঃ** হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে যারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং আন্দোলনের কোনো না কোনো কাজের সাথে যারা সম্পৃক্ত থাকেন তারা প্রাথমিক সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।
- **ঐক্যবদ্ধ সদস্যঃ** হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে যারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন কিন্তু আন্দোলনের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে দায়বদ্ধ নন তারা হেযবুত তওহীদের ঐক্যবদ্ধ সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।

ধারা-১৯) সদস্যপদঃ

(ক) সদস্য হওয়ার যোগ্যতা: ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেকোন ব্যক্তি যিনি হেযবুত তওহীদের এমামকে এমাম হিসাবে মেনে নিবেন, এ আন্দোলনের বক্তব্যকে সত্য বলে গ্রহণ করবেন এবং আন্দোলনের নীতিমালা ও কর্মসূচি মেনে এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে সম্মত থাকবেন তিনিই এর প্রাথমিক সদস্যপ্রাপ্তির যোগ্য।

- **সদস্য হওয়ার পদ্ধতিঃ** আন্দোলনের যেকোন শাখা কমিটির সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে নির্দিষ্ট অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে সদস্য হতে হবে।
- **অঙ্গীকারনামাঃ** বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের জন্য পৃথক পৃথক অঙ্গীকারনামা/ অঙ্গীকারপত্র/সম্মতিপত্র রয়েছে যথা: সক্রিয় সদস্যের অঙ্গীকারনামা, প্রাথমকি সদস্যদের অঙ্গীকারনামা, ঐক্যবদ্ধ সদস্যদের অঙ্গীকারনামা, কমিটির প্রধানদের অঙ্গীকারনামা/অঙ্গীকারপত্র/সম্মতিপত্র ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সম্মতিপত্র। (অঙ্গীকারনামার নমুনা পরিশিষ্ট অংশে দেখুন)

- **সদস্যের কর্তব্য:** নিজে তওহীদের উপর, সত্যের উপর অটল থাকা, সত্যকে ধারণ করা এবং অন্য মানুষকেও সত্যের পথে আহ্বান করা। নিজের জীবন ও সম্পদ মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এই সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে আন্দোলনের যাবতীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নীতিগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে মান্য করা। অন্যান্য সকল সদস্যকে আন্দোলনের নীতি-প্রক্রিয়া মান্য করার জন্য উৎসাহিত করা, সকলের সাথে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। নিজেদের মধ্যকার ঐক্য বিনষ্ট হয় এরূপ কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

- **সদস্যের অধিকার:** এই আন্দোলনের যেকোন সদস্য আন্দোলনের নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করে নিজের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। তবে কোনোভাবেই একজনের পেছনে আরেকজন গীবত করবে না।

- **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:** কোনো সদস্য যদি আন্দোলনের শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ করেন তাহলে তাকে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানোর জন্য বলবেন। উপযুক্ত কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে এমাম/চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক বিশৃঙ্খলার গুরুত্ব বিচার করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রীয় আইন মোতাবেক কোনো দণ্ডনীয় অপরাধ করে থাকেন তাহলে তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করা হবে। কোনো জেলা কমিটি কিংবা জেলা কমিটির অধঃস্তন কোনো কমিটি শাস্তি প্রদানের অধিকার প্রাপ্ত হবে না, কেবল কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করতে পারবে।

- **সদস্যপদ বাতিল:** কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সংগঠনের নীতি ও শৃঙ্খলাপরিপন্থী কার্যকলাপের গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হলে এমাম/চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক তার সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করবে।

- **সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ:** কেউ যদি স্বেচ্ছায় আন্দোলনের সদস্যপদ বাতিল করতে চান তাহলে তিনি লিখিতভাবে তা সাধারণ সম্পাদককে অবগত করবেন। পদত্যাগপত্র চেয়ারম্যান বা এমাম কর্তৃক গৃহীত হলে সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা-২০) শাখা স্থাপন:

হেযবুত তওহীদের কার্যক্রম, কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান বা এমামের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ শাখা গঠন করা যাবে;

(ক) জেলা শাখা (খ) থানা/উপজেলা শাখা (গ) পৌর শাখা (ঘ) মহানগর/নগর শাখা (ঙ) ইউনিয়ন শাখা (চ) ওয়ার্ড শাখা (ছ) গ্রাম শাখা (জ) বিশ্ববিদ্যালয় শাখা (ঝ) কলেজ শাখা (ঞ) বৈদেশিক শাখা ইত্যাদি।

ধারা-২১) কমিটি গঠনঃ

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রয়োজন মোতাবেক চেয়ারম্যান বা এমামের অনুমোদন সাপেক্ষে সকল স্তরের উপদেষ্টা কমিটি, সকল স্তরের শাখা, অঙ্গ, সহযোগী সংগঠনের কমিটি, কর্মসূচী/প্রকল্প ভিত্তিক বিভিন্ন কমিটি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, দিবস পালন, জাতীয় সম্মেলন বা যেকোন উদ্দেশ্যে যেকোন কমিটি, উপ কমিটি গঠন করা যাবে।

ধারা-২২) শাখা কমিটি বাতিল বা অনুমোদন প্রত্যাহারঃ

যেকোন স্তরের শাখা কমিটি দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হলে বা তাদের দ্বারা কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হলে বা কোনো অনিয়ম, কোনো জনস্বার্থবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী বা রাজনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ছাড়াই চেয়ারম্যান/এমাম যেকোন স্তরের শাখার স্বীকৃতি বাতিল, কমিটির অনুমোদন বাতিল বা প্রত্যাহার এবং পুনর্গঠন করতে পারবেন।

ধারা-২৩) কেন্দ্রীয় কমিটির কাঠামোঃ

(ক) **চেয়ারম্যান/এমামঃ** চেয়ারম্যান/এমাম হবেন হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা, নীতি-নির্ধারক, কর্মবিধায়ক, নিয়ন্ত্রক। তিনিই আন্দোলনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। তিনিই আন্দোলনের ব্যবস্থাপনা ও যেকোন আদেশ নির্দেশ, অগ্রগতি, প্রস্তাব বিবেচনা, সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন। তিনিই কেন্দ্রীয় কমিটির পদের সংখ্যা এবং সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করবেন। তিনি হেযবুত তওহীদের সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সম্পাদক মনোনয়ন করবেন। সকল সদস্য-সদস্যা যে কোনো বিষয়ে চেয়ারম্যান/এমামের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) **সাধারণ সম্পাদকঃ** সাধারণ সম্পাদক এমাম/চেয়ারম্যানের সকল আদেশ-নির্দেশ সকল স্তরের শাখা সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পৌছাবেন এবং শাখাসমূহের কার্যাবলী তদারকি করবেন। সকল কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ারম্যান/এমামের নিকট পেশ করবেন।

(গ) **যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকঃ** সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক থাকবেন। একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের অধীনে একাধিক সাংগঠনিক বিভাগ থাকবে। তারা সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক সম্পাদকের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলরূপে বিভাগগুলোতে অবস্থান করবেন। তারা আন্দোলন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ হুবহু বাস্তবায়িত হয় কিনা তা নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিভাগে সরেজমিনে থেকে তদারক করবে।

(ঘ) **সাংগঠনিক সম্পাদক:** সাংগঠনিক সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহের দায়িত্ব পালন করবেন। তার নেতৃত্বে জেলা কমিটির সভাপতিগণ আন্দোলনের ঘোষিত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করবেন।

(ঙ) **অর্থ সম্পাদক:** যারা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত তারা স্বেচ্ছায় যে অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করবেন সে অর্থকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ, হিসাব ও ব্যবহার করার জন্য আন্দোলনের একটি অর্থবিভাগ থাকবে। এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন অর্থ সম্পাদক। তিনি সম্পদ ও অর্থ লেনদেনের সকল হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ অল্প কিংবা অধিক যাই হোক না কেন তা লিপিবদ্ধ রাখবেন।

- **যুগ্ম অর্থ সম্পাদক:** অর্থ সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম অর্থ সম্পাদক থাকবেন। অর্থ সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী অর্থ সম্পাদক:** যুগ্ম অর্থ সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী অর্থ সম্পাদক থাকবেন। তিনি অর্থ সম্পাদক ও যুগ্ম অর্থ সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(চ) **দপ্তর সম্পাদক:** দপ্তর সম্পাদকের কাজ মূলত সাচিবিক কাজ। দপ্তর সম্পাদক চেয়ারম্যান/এমামের সকল আদেশ, নিষেধ, নির্দেশনাসমূহ সাধারণ সম্পাদক এর মাধ্যমে সংগ্রহ করবেন, সেগুলো যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ করবেন ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের নিকট সরবরাহ করবেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের চলমান কার্যক্রমের যাবতীয় প্রতিবেদন সাধারণ সম্পাদক মাধ্যম চেয়ারম্যান/এমামের নিকট সরবরাহ করবেন।

- **যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক:** দপ্তর সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক থাকবেন। দপ্তর সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী দপ্তর সম্পাদক:** যুগ্ম দপ্তর সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী দপ্তর সম্পাদক থাকবেন। তিনি দপ্তর সম্পাদক ও যুগ্ম দপ্তর সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ছ) **সাহিত্য সম্পাদক:** সাহিত্য হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের বড় একটি হাতিয়ার। এ কারণে প্রতিটি ঐশীগ্রন্থ অসাধারণ সাহিত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আমরা যদি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা স্মরণ করি দেখব সেখানে কবিতা, গান, উপন্যাস, সাহিত্যপত্রগুলো কী দারুণ ভূমিকা রেখেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও দেশপ্রেমিক শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেক বড় ভূমিকা ছিল। বর্তমানেও আমরা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, মানবতার কল্যাণে একটি গণজাগরণ সৃষ্টি করতে সংগ্রাম করছি। লেখক, কবি, নাট্যকারদের অংশগ্রহণ এ সংগ্রামকে নিঃসন্দেহে অনেক বেগবান করতে পারে। "জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের

রক্তের চেয়ে পবিত্র” এ কথাটি সার্থক হয় তখনই যখন একজন জ্ঞানী মানুষের লেখায় শত সহস্র মানুষ সত্য প্রতিষ্ঠায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীও একজন সুলেখক ছিলেন যিনি আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলামকে অত্যন্ত সহজ-সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর সেই আদর্শকে, তাঁর লেখাকে যথাযথ সাহিত্যমান রক্ষা করে জাতির অপরাপর সাহিত্যসেবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আন্দোলনের সকল কমিটিতে সাহিত্য বিভাগ থাকবে, যার দায়িত্ব পালন করবেন একজন সাহিত্য সম্পাদক।

- **যুগ্ম সাহিত্য সম্পাদক:** সাহিত্য সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম সাহিত্য সম্পাদক থাকবেন। সাহিত্য সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী সাহিত্য সম্পাদক:** যুগ্ম সাহিত্য সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী সাহিত্য সম্পাদক থাকবেন। তিনি সাহিত্য সম্পাদক ও যুগ্ম সাহিত্য সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(জ) **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক:** অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, ন্যায় ও সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গকারী জাতি তৈরি করতে গেলে অবশ্যই একদল সু-প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী প্রয়োজন। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলছেন, “যারা জানে আর যারা জানে না তারা উভয়ে কি সমান?” যারা জানে তাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়াই হচ্ছে শিক্ষা আর শিক্ষাগ্রহণ করা ফরজ। স্বভাবতই এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকার হতে হবে। এজন্য হেযবুত তওহীদ আন্দোলনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ থাকবে যার দায়িত্ব পালন করবেন একজন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক। তিনি সালাহ ও সওমের মাধ্যমে মো'মেনদের শারীরিক ও আত্মিক উভয়প্রকার উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করবেন। আকিদা সহীহ করার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবেন। বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি রসুলাল্লাহ কেন এসেছেন, কীভাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী অর্ধ দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, কীভাবে আল্লাহর দেয়া সেই প্রকৃত ইসলাম বিকৃত হলো, কীভাবে আবার বর্তমান সময়ে প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা মানুষের সামনে তুলে ধরা যায় এ সমস্ত কিছুই শিক্ষার বিষয়বস্তুর আওতায় আসবে। তিনি আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ঘরোয়া আলোচনা, বিভিন্ন পত্রিকা ও বই পড়া (পাঠচক্র), প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করবেন।

- **যুগ্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক:** শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক থাকবেন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই হবে তার মূল কাজ।
- **সহকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক:** যুগ্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক থাকবেন। তিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও যুগ্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ঝ) ক্রীড়া সম্পাদক: একটি শক্তিশালী, বহির্মুখী, গতিশীল জাতির জন্য প্রয়োজন সুস্থ, সবল, গতিশীল, উদ্দমী নাগরিক। অসুস্থ, রুগ্ন দুর্বল নাগরিকদের দিয়ে জাতির সামষ্টিক উন্নতি আশা করা যায় না। একটি জাতির ক্ষুদ্রতম একক হলো ব্যক্তি। ব্যক্তির সম্মিলিত শক্তিই হলো একটি জাতির শক্তি। আর সুস্থ, সবল নাগরিক গড়ে তুলতে খেলাধুলা ও শরীর চর্চার কোনো বিকল্প নেই। কাজেই হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সদস্যদের মধ্যে শারীরিক সুস্থতা, ক্ষিপ্রতা, গতিশীলতা, সাহসিকতা ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে। এক্ষেত্রে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বহিরাঙ্গনের (আউটডোর) খেলা যেমন কাবাডি, হা-ডু-ডু, ফুটবল, দৌড়, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেসব খেলা মানুষকে অন্তর্মুখী ও স্থবির করে ফেলে সেগুলো নিরুৎসাহিত করা হবে এবং যেকোন খেলায় অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অর্থের লেনদেন, জুয়া বা বাজি ইত্যাদি এড়িয়ে চলতে হবে। ইসলামে শরীর গঠনমূলক খেলাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহর রসুল (স.) স্বয়ং মসজিদে নববীর সামনে খেলাধুলার আয়োজন করতেন, কুস্তি, তীর বা বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতে নিজে অংশ নিতেন এবং তাঁর আসহাবদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী নিজেও একজন জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়াবিদ ছিলেন। তিনি মানুষখেকো বাঘসহ বহু হিংস্র প্রাণী শিকার করেছেন। তিনি ফুটবল, কাবাডি খেলতেন। রায়ফেল শ্যুটার হিসাবে তিনি বিশ্ব অলিম্পিকে একজন প্রতিযোগী হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। যুব সমাজকে সুস্থ বিনোদনে উৎসাহী করার জন্য এবং বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডিকে আবার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি তাঁর জীবদ্দশায় 'তওহীদ কাবাডি দল' প্রতিষ্ঠা করেন। যার মাধ্যমে হেযবুত তওহীদের সদস্যরা সারা দেশে অসংখ্য কাবাডি টুর্নামেন্টের আয়োজন করে দেশের জাতীয় খেলা কাবাডির হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট আছেন। তওহীদ কাবাডি দল জাতীয় কাবাডি ফেডারেশনের সদস্য হিসাবে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের পরিচয়ও দিয়েছে। মাননীয় এমামুয্যামানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমও 'তওহীদ ফুটবল ক্লাব' গঠন করেছেন।

কাজেই হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে খেলা-ধুলার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য একজন ক্রীড়া সম্পাদক থাকবেন।

- **যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক:** ক্রীড়া সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক থাকবেন। ক্রীড়া সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক:** যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক থাকবেন। তিনি ক্রীড়া সম্পাদক ও যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ঞ) **আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক:** আন্দোলনের কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহের গুরুত্ব অপরিসীম। আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ করবেন। এছাড়াও তিনি দুষ্প্রাপ্য/পুরাতন পাণ্ডুলিপি/দেশের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া লোকগীতিসহ পুথি সংগ্রহ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন।

- **যুগ্ম আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক:** আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক থাকবেন। আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক:** যুগ্ম আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক থাকবেন। তিনি আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক এবং যুগ্ম আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ট) **সাংস্কৃতিক সম্পাদক:** সংস্কৃতি একটি জাতির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শত সহস্র বছরের কাল পরিক্রমায় একটা জনগোষ্ঠীর মাঝে সংস্কৃতি গড়ে উঠে। তাদের পেশা, আবহাওয়া, প্রকৃতি ইত্যাদি সবকিছুই তাদের সংস্কৃতি নির্মাণে ভূমিকা রাখে। সেই জনগোষ্ঠীর ভাষা, চালচলন, পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার সব কিছুই তাদের সংস্কৃতির অংশ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোনো আঞ্চলিক নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে নিষিদ্ধ করেন নি, কারো সংস্কৃতিকেই অবজ্ঞা করেন নি। কেবল সমাজের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছে যে কেবল অশ্লীলতা করা যাবে না, আল্লাহর নাফরমানির প্রসার ঘটে এমন কিছু করা যাবে না। কারণ অশ্লীলতা মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে নষ্ট করে দেয়। যা একটি সমাজের মধ্যে ঐক্যের বদলে কলহ সৃষ্টি করে, যা শান্তি সম্প্রীতির পরিবর্তে দাঙ্গা সৃষ্টি করে, ভ্রাতৃত্বের বদলে শত্রুতার জন্ম দেয়

তা সুস্থ সংস্কৃতি নয়। অশ্লীলতা কেবল ধর্মে নয়, যেকোন আইনে নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে। হেযবুত তওহীদ অশ্লীলতামুক্ত, মার্জিত, সাবলীল ধারার সংস্কৃতির চর্চা করবে।

নবী করিম (স.) আরবে প্রচলিত সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করেছেন, মদীনায় থাকা অবস্থায় তিনি নিজে গান শুনেছেন, গানের অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে একটা ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলো যেমন নাচ, গান, চিত্রকলা, ভাস্কর্য নির্মাণ ইত্যাদি ধর্মে অনুমোদিত নয়। মূলত অশ্লীলতার অনুপ্রবেশের কারণেই বিভিন্ন ধর্মবেত্তা আলেমরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, গান, নাটক, বাদ্য, অভিনয়, নৃত্য এগুলোকে হারাম বলে রায় দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ অনুচিত। মাথা ব্যথা হলেই মাথা কেটে ফেলার নীতি নেওয়া কখনও যৌক্তিক নয়। সংস্কৃতি থেকে অশ্লীলতাকে দূর করলে যে শুদ্ধ সংস্কৃতি অবশিষ্ট থাকবে তা মানুষের মননশীলতা বৃদ্ধি করবে, মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করবে, মানুষকে মানবতাবোধে উজ্জীবিত করবে, চিন্তা ও চেতনায় মানুষকে প্রগতিশীল করবে। যে গান, নৃত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি শিল্পচর্চা মানবজাতির কল্যাণে সহায়ক হবে, মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ-মানবতাবোধ জাগ্রত করবে, স্রষ্টার প্রতি প্রেম-বিনয়-আনুগত্য জাগ্রত করবে, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবে, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ সমাজ গঠনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে সেগুলো কেবল বৈধ নয়, আমরা মনে করি সেগুলো ইবাদততুল্য।

কোকিলের কণ্ঠের সুর আল্লাহরই দান, তাই সুর নিষিদ্ধ হতে পারে না। বাতাসে শস্যের আন্দোলনে নৃত্যের ছন্দ আল্লাহরই নিদর্শন, তাই আল্লাহ নাচকে হারাম করতে পারেন না এবং তিনি এগুলো হারাম করেনও নি। কাজেই হেযবুত তওহীদ আন্দোলন আমাদের দেশীয় যেকোন বৈধ, অশ্লীলতামুক্ত ও শুদ্ধ সংস্কৃতিকে স্বীকার করে, চর্চা করে ও পৃষ্ঠপোষণ করে। মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন বিশুদ্ধ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ শ্রোতা ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি গান শিখেছিলেন ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে। সেই সূত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। আল্লাহ তাঁকে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কণ্ঠ এবং সুর দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা চান নি। তবে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণে সাধ্যমতো অবদান রেখে গেছেন। তিনি নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান' গানটিকে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের দলীয় সঙ্গীত হিসাবে ঘোষণা করেন।

এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এ আন্দোলনে একটি সাংস্কৃতিক বিভাগ থাকবে যার পরিচালনা করবেন একজন সাংস্কৃতিক সম্পাদক।

ধারা-২৩) কেন্দ্রীয় কমিটির কাঠামোঃ

- **যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক:** সাংস্কৃতিক সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক থাকবেন। সাংস্কৃতিক সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদক:** যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদক থাকবেন। তিনি সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ঠ) **তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক:** আধুনিক যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রগামী হয়েছে। অনেক মানুষ যতটা না ছাপানো পত্রিকা পড়েন তার চেয়ে অনেক বেশি ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। কাজেই তথ্যপ্রযুক্তির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে একটি আইটি বিভাগ থাকবে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সংগঠনের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

- **যুগ্ম তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক:** তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক থাকবেন। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক:** যুগ্ম তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক থাকবেন। তিনি তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও যুগ্ম তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ড) **আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক:** বর্তমানে পৃথিবীতে অনেকগুলো ধর্মের অনুসারী থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কিন্তু পৃথিবীতে আলাদা আলাদা ধর্ম পাঠান নি। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর মনোনীত নবী-রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। সেই নবীদেরকে যারা গ্রহণ করে নিয়েছেন তারা সত্য পথে উঠেছেন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় সেই ধর্ম যখন পরবর্তীতে বিকৃত হয়ে গেছে তখন তাও মানুষকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাঁর কোনো মনোনীত মহামানবের মাধ্যমে তাদের কাছে আবার সত্য পথের দিক-নির্দেশনা পাঠিয়েছেন। এবারো কিছু মানুষ সেই সত্য তাদের জীবনে গ্রহণ করেছে। আর যারা তা গ্রহণ করে নেয় নি তারা পূর্ববর্তী বিকৃত ধর্মে রয়ে গেছে। এভাবেই কালপরিক্রমায় বিশ্বজুড়ে বহু ধর্ম সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু সব ধর্মই একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা, তাদের মূল এক জায়গাতেই। আদি পিতা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়া থেকে আগত পুরো মানবজাতি আসলে এক জাতি, তারা প্রত্যেকে ভাই-ভাই। তাদের

মধ্যে বিরাজিত সকল বিভেদ দূর করে একজাতিতে পরিণত করার জন্যই শেষ রসুলের আবির্ভাব হয়েছিল। পূর্ববর্তী নবীদের আনীত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অনেক কিছু মানুষের দ্বারা বিকৃত হয়েছে, অনেক কিছু প্রবিষ্ট হয়েছে, অনেক নবীর নাম ভাষা ও উচ্চারণের তারতম্যের দরুন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাদের প্রদত্ত শিক্ষা হয় ভুলে যাওয়া হয়েছে, না হয় বিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে পূর্ববর্তী সকল নবী ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ কেতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অর্থাৎ ঈমান আনা।

সাম্প্রদায়িক ঘৃণাবিদ্বেষ এখন সমগ্র বিশ্বকে একটি মহাযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। বহুদেশে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বর্বর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে, স্বদেশ থেকে উৎখাত করছে। প্রতিটি ধর্মের উগ্রপন্থী গোষ্ঠী অপর ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে এবং রাজনৈতিক ইন্ধনে দাঙ্গাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে। এসবের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিপ্রয়োগের পন্থাই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। আক্রান্ত গোষ্ঠীকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তাদের উপাসনালয়ে পাহারার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হামলা হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা মনে করি এগুলো প্রকৃতপক্ষে সমস্যার সমাধান নয়।

আমরা যদি সত্যিই একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে চাই, প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে চাই তাহলে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি ঐক্যসূত্র সৃষ্টি করতে হবে, আন্তঃধর্মীয় বন্ধন তৈরি করতে হবে যেন তারা তাদের বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অপর ধর্মের অনুসারীদেরকে শত্রু জ্ঞান না করে ভাই মনে করতে উৎসাহী হয়।

সেটা কীভাবে সম্ভব হবে? সেটা ধর্মগুলোর মধ্যে বিরাজিত মিলগুলো খুঁজে বের করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মগুলোর মৌলিক শিক্ষার মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ বা বৈপরিত্য নেই। যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে মতভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলো ধর্মের কোনো মৌলিক বিষয় নয় এবং সেগুলো সৃষ্টি হয়েছে কথিত ধর্মের ধারক বাহক ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের কোনো বিনিময় চলে না। বিনিময় নিলে ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। কাজেই ধর্মের কাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে এবং বিনিময় নিতে হবে কেবল আল্লাহর কাছ থেকে। সব ধর্মেই এ শিক্ষা রয়েছে। তথাপি ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাদের কায়েমী স্বার্থে এই বিভক্তির দেওয়াল খাড়া করে রেখেছে। যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা এই উপমহাদেশে ডিভাইড এন্ড রুল নীতির প্রয়োগ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও শত্রুতার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল নিজেদের শাসনকে নিরাপদ করার জন্য। তারা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগ করে সেই শত্রুতাকে স্থায়ীরূপ দিয়ে গেছে। এখন হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করে যাচ্ছে

প্রতিটি ধর্মের মধ্যে যে মিলগুলো রয়েছে সেগুলোকে সামনে নিয়ে এসে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মজবুত বন্ধন তৈরি করতে, আন্তঃধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে, একজনকে আরেকজনের সহযোগী করে তুলতে। আমরা চেষ্টা করছি তাদের বিস্মৃত অতীত মনে করিয়ে দিতে। আমরা বলছি আমি যে স্রষ্টার সৃষ্টি তুমিও সেই স্রষ্টারই সৃষ্টি। স্রষ্টা কখনও দুইজন নয়। সুতরাং তোমার আমার বিরোধের কোনো কারণ নেই। তুমি স্রষ্টার একটি গ্রন্থ চুমু দিচ্ছ, পাঠ করছ, ভাবছ তোমার সওয়াব হবে আর অপর একটি গ্রন্থে আগুন দিচ্ছ তাতে কি স্রষ্টার অসম্মান হচ্ছে না? এ বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা হেযবুত তওহীদের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম চালানোর জন্য হেযবুত তওহীদে একটি আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ বিভাগ থাকবে যার দায়িত্ব পালন করবেন একজন আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক।

- **যুগ্ম আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক:** আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক থাকবেন। আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক:** যুগ্ম আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক থাকবেন। তিনি আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদক ও যুগ্ম আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ঢ) **রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক:** রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকবেন, খোঁজ খবর নিবেন। সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

- **রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক যুগ্ম সম্পাদক:** রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদকের অধীনে একজন রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক যুগ্ম সম্পাদক থাকবেন। রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সহকারী সম্পাদক:** রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক যুগ্ম সম্পাদকের অধীনে একজন রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সহকারী সম্পাদক থাকবেন। তিনি রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক যুগ্ম সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ণ) **প্রকাশনা সম্পাদক:** বিশ্বের খ্যাতিমান দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং মাননীয় এমামুয্যামানের লিখিত বইগুলোসহ আন্দোলনের হ্যান্ডবিল, বই, পোস্টার,

সিডিসহ অন্যান্য সকল মুদ্রিত প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও প্রকাশ ও বিক্রয় প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করার জন্য আন্দোলনের একটি প্রকাশনা বিভাগ থাকবে, যার দায়িত্ব পালন করবেন প্রকাশনা সম্পাদক।

- **যুগ্ম প্রকাশনা সম্পাদক:** প্রকাশনা সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম প্রকাশনা সম্পাদক থাকবেন। প্রকাশনা সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।

- **সহকারী প্রকাশনা সম্পাদক:** যুগ্ম প্রকাশনা সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী প্রকাশনা সম্পাদক থাকবেন। তিনি প্রকাশনা সম্পাদক ও যুগ্ম প্রকাশনা সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ত) **মহিলা বিষয়ক সম্পাদক:** পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীর অর্ধেক হলো নারী। কাজেই এ অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কোনো জাতির সামগ্রিক উন্নতি কল্পনা করা যায় না। তাই যে সমাজে নারীরা পশ্চাৎপদ, কুসংস্কার ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন সে সমাজে কোনোদিন অগ্রগতি সম্ভব নয়। বাবা আদমকে (আ.) সৃষ্টি করার পর জান্নাতের অনুপম পরিবেশ ও সুবিধাও তাঁর কাছে বিবর্ণ মনে হয়েছিল একজন সঙ্গীর অভাবে। তখন আল্লাহ মা হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। কাজেই নারী বা পুরুষ কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তারা একে অপরের পরিপূরক। মানবজাতির অস্তিত্বের প্রয়োজনে জীবিকা সংগ্রহ আবশ্যক। বাইরের প্রতিকূল পরিবেশে পরিশ্রমের কাজ করে জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী শরীর। আল্লাহ পুরুষকে সেই সুগঠিত পেশী ও কাঠামো দিয়ে তৈরি করেছেন এবং সাধারণভাবে পুরুষকে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আর নারীকে করেছেন মায়া মমতায় পরিপূর্ণ এবং সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের উপযুক্ত। তাই প্রাকৃতিক কারণেই নারীর প্রধান দায়িত্ব সন্তান লালন এবং তাকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তবে বিশেষ প্রয়োজনে পুরুষকেও যেমন ঘরের কাজ করতে হয়, তেমনি প্রয়োজন পড়লে নারীকেও বাইরের কাজ করতে হয়। ইসলাম এতে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে না। শুধু তাই নয়, সামষ্টিক জীবনের যেকোন অঙ্গনে নারী স্বাধীনভাবে নিজের যোগ্যতা মোতাবেক ভূমিকা রাখাকে ইসলাম উৎসাহিত করে।

ইসলামপূর্ব আরবে নারীর কোনো সম্মান ছিল না, তাদেরকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হতো। কন্যা শিশু জন্ম নিলে তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে জীবিত কবর দিয়ে দেওয়া হতো। সেই সমাজের নারীদেরকে রসুলাল্লাহ (স.) এমন একটি নিরাপদ সমাজ উপহার দিলেন যে, একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ে সারা গায়ে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করতে পারত, তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা জাগ্রত হতো না। রসুলাল্লাহর

সময় নারী-পুরুষ মসজিদে একত্রে সালাহ্ কায়েম করতেন, যেকোন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শসভায় নারীরাও অবাধে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করতেন। নারীরা যুদ্ধে আহতদের বহন করে এনে তাদেরকে চিকিৎসা দিতেন, তারা নিজেরাও যুদ্ধের মতো ঝুঁকিপূর্ণ, দুঃসাহসী ও শ্রমসাধ্য কাজে অংশ নিতেন। তারা শহরের বাজার ব্যবস্থাপনার মতো কঠিন দায়িত্বও পালন করেছেন। যে জাহেলি যুগে নারীদের যোগ্যতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি আর সাহসের কোনো স্বীকৃতি ছিল না, রসুলাল্লাহ এসে নারীদের সম্পর্কে সেই সমাজের ধারণা পাল্টে দিলেন। হেযবুত তওহীদ নারীদেরকে তাদের আল্লাহ-প্রদত্ত, রসুলপাক (সা.) এর রেখে যাওয়া আদর্শের অনুসারে প্রাকৃতিক অধিকার ও সম্মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। ধর্মের দোহায় দিয়ে নারীকে গৃহবন্দী বা বাক্সবন্দী করে রাখা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নারী তার জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা, শিক্ষা, শক্তি, সাহস ও বুদ্ধির গুণে পুরুষের পাশাপাশি যে কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাই হেযবুত তওহীদের নারীরা আন্দোলনের সকল কাজে পুরুষদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করবেন এবং তাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সামর্থ্য দিয়ে ভূমিকা রাখবেন। নারীদের এই ভূমিকা গ্রহণকে নিশ্চিত করতে আন্দোলনে একজন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক থাকবেন। তিনি হেযবুত তওহীদের নারী সদস্যদেরকে আন্দোলনের সমস্ত কাজে সক্রিয় রাখতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, ধর্মীয় বা অন্য যেকোন বৈধ নারী সংগঠনগুলোর সাথে নিয়ে নারী উন্নয়নে যৌথভাবে সভা সেমিনার সমাবেশ মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন, নারীদের জন্য উদ্বুদ্ধকারী ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।

- **যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদক:** মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদক থাকবেন। মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।

- **সহকারী মহিলা বিষয়ক সম্পাদক:** যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী মহিলা বিষয়ক সম্পাদক থাকবেন। তিনি মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(থ) আইন সম্পাদক: আন্দোলন প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে মাননীয় এমামুয্যামান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো কাজ হেযবুত তওহীদ করবে না। কিন্তু আন্দোলন তার পথ চলা শুরু করার পর থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মব্যবসায়ী এবং স্বার্থান্বেষী একটি গোষ্ঠীর অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রে আমাদের উপর বহু নির্যাতন হয়েছে। আইন ভঙ্গ না করার নীতিতে অটল থেকে আমরা আইনগতভাবেই এসব প্রতিবন্ধতা মোকাবেলার চেষ্টা করেছি। আন্দোলনের আইন-আদালত বিষয়ক সমস্তকিছু দেখাশোনা ও পরিচালনা

করার জন্য, মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আন্দোলনের সকল পর্যায়ের কমিটিতে আইনি সহায়তা বিভাগ থাকবে যার প্রধান "আইন সম্পাদক" পদের অধিকারী হবেন। তিনি চেয়ারম্যান/এমামের অনুমোদনক্রমে আন্দোলন ছাড়াও প্রয়োজন হলে দেশের যেকোন দরিদ্র, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে আইনী সহায়তা দানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

- **যুগ্ম আইন সম্পাদক:** আইন সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম আইন সম্পাদক থাকবেন। আইন সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী আইন সম্পাদক:** যুগ্ম আইন সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী আইন সম্পাদক থাকবেন। তিনি আইন সম্পাদক ও যুগ্ম আইন সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(দ) **প্রচার সম্পাদক:** হেযবুত তওহীদের মূল কাজই হলো একটি সত্য আদর্শকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা, ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে প্রচলিত যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই পরিচালনা করা। এ প্রচারকার্যক্রমকে গণমানুষের কাছে তাদের জন্য উপযুক্ত ও বোধগম্য পদ্ধতিতে তুলে ধরাই প্রচার সম্পাদকের কাজ।

- **যুগ্ম প্রচার সম্পাদক:** প্রচার সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম প্রচার সম্পাদক থাকবেন। প্রচার সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী প্রচার সম্পাদক:** যুগ্ম প্রচার সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী প্রচার সম্পাদক থাকবেন। তিনি প্রচার সম্পাদক ও যুগ্ম প্রচার সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ধ) **কর্মসংস্থান সম্পাদক:** বেকারত্ব একটি অভিশাপ। হেযবুত তওহীদের অন্যতম নীতি হচ্ছে এর কর্মক্ষম সদস্যরা কেউ বেকার থাকতে পারবে না, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ যোগ্যতা মোতাবেক উপার্জন করবে। আল্লাহ মাটি দিয়েছেন, পানি দিয়েছেন, কাজেই উৎপাদনযোগ্য প্রতি ইঞ্চি মাটিকে উৎপাদনের আওতায় আনার চেষ্টা করা সক্ষম মো'মেনের দায়িত্ব। এতে ব্যক্তি যেমন উপকৃত ও স্বাবলম্বী হয়, জাতিও সমৃদ্ধ হয়। আল্লাহর রসুল (স.) বলেছেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, জীবিকা হাসিল করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করো এবং তোমাদের প্রচেষ্টার পরিপূর্ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, কোনো মো'মেনের সত্তাকে দুনিয়ায় বেকার এবং অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নি। বরং তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কর্ম ও কর্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত। কর্ম ও প্রচেষ্টার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অল্পে সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার

অর্থ এ নয় যে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা এবং নিজের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া। আল্লাহর উপর ভরসা করে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা নিতান্তই জরুরি বিষয়।

আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, দুনিয়ায় যত নবী-রসুল এসেছেন তাদের সবাই রেযেক হাসিলের জন্য চেষ্টা- সাধনা করতেন এবং নিজেদের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতেন না। অতএব তোমরাও রুজি হাসিলের জন্য প্রচেষ্টা করো। শ্রমিক-মজুরের কাজ করা এবং লাকড়ির বোঝা নিজের মাথায় উঠানো অন্যের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। যার জীবিকা উপার্জনের সামর্থ্য রয়েছে অন্যের কাছে হাত পাতা তার জন্য খুবই অসম্মানজনক। সে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত এবং শেষ বিচারের দিনও তাকে এমন অবস্থায় হাজির করা হবে যে তার চেহারায় গোশত থাকবে না। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের বলছি, যার কাছে একদিনের খাদ্যও মজুদ রয়েছে তার জন্য অন্যের কাছে হাত পাতা অবশ্যই হারাম।"

এমামুয্যামান জমিদার পরিবারের বড় ছেলে হয়েও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার সময় তিনি আন্দোলনের নেতার নির্দেশে কলকাতার রাস্তায় কমলার ব্যবসা করেছেন। তরুণ বয়সে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা করেছেন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিয়মিত রোগী দেখে গেছেন। তা থেকে যে আয় হতো তা দিয়েই তিনি সংসার চালাতেন। হেযবুত তওহীদের সদস্যরা আন্দোলনের কাজে অধিক সময় ব্যয় করা সত্ত্বেও যেন একে অপরের সহযোগিতাক্রমে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন-জীবিকা চালিয়ে যেতে পারেন, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজন পড়ে একটি সুন্দর পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। এই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্দোলনে কর্মসংস্থান সম্পাদক থাকবেন। যিনি বেকারদের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখবেন।

- **যুগ্ম কর্মসংস্থান সম্পাদক:** কর্মসংস্থান সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম কর্মসংস্থান সম্পাদক থাকবেন। কর্মসংস্থান সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী কর্মসংস্থান সম্পাদক:** যুগ্ম কর্মসংস্থান সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী কর্মসংস্থান সম্পাদক থাকবেন। তিনি কর্মসংস্থান সম্পাদক ও যুগ্ম কর্মসংস্থান সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ন) তথ্য সম্পাদক: আন্দোলনের কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে সঠিক তথ্য সরবরহারে গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য সম্পাদক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করবেন।

ধারা-২৩) কেন্দ্রীয় কমিটির কাঠামোঃ

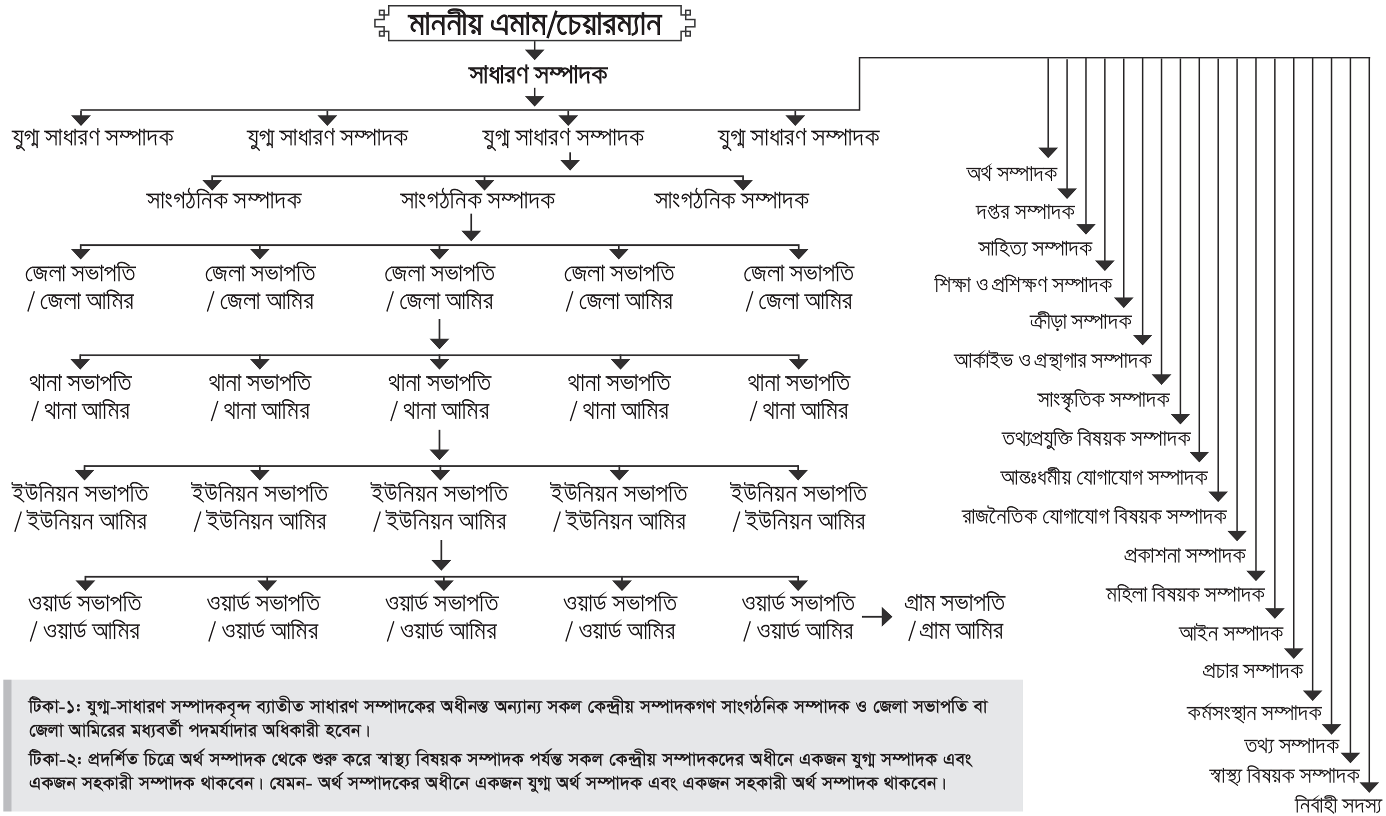

টিকা-১: যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ ব্যাতীত সাধারণ সম্পাদকের অধীনস্ত অন্যান্য সকল কেন্দ্রীয় সম্পাদকগণ সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা সভাপতি বা জেলা আমিরের মধ্যবর্তী পদমর্যাদার অধিকারী হবেন।

টিকা-২: প্রদর্শিত চিত্রে অর্থ সম্পাদক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক পর্যন্ত সকল কেন্দ্রীয় সম্পাদকদের অধীনে একজন যুগ্ম সম্পাদক এবং একজন সহকারী সম্পাদক থাকবেন। যেমন- অর্থ সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম অর্থ সম্পাদক এবং একজন সহকারী অর্থ সম্পাদক থাকবেন।

- **যুগ্ম তথ্য সম্পাদক:** তথ্য সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম তথ্য সম্পাদক থাকবেন। তথ্য সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী তথ্য সম্পাদক:** যুগ্ম তথ্য সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী তথ্য সম্পাদক থাকবেন। তিনি তথ্য সম্পাদক ও যুগ্ম তথ্য সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(প) স্বাস্থ্য সম্পাদক: স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আন্দোলনের সকল সদস্য ও সদস্যাগণের সু-স্বাস্থ্য যাতে রক্ষা হয় সে ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করাই হবে স্বাস্থ্য সম্পাদকের মূল কাজ।

- **যুগ্ম স্বাস্থ্য সম্পাদক:** স্বাস্থ্য সম্পাদকের অধীনে একজন যুগ্ম স্বাস্থ্য সম্পাদক থাকবেন। স্বাস্থ্য সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করাই তার মূল কাজ।
- **সহকারী স্বাস্থ্য সম্পাদক:** যুগ্ম স্বাস্থ্য সম্পাদকের অধীনে একজন সহকারী স্বাস্থ্য সম্পাদক থাকবেন। তিনি স্বাস্থ্য সম্পাদক ও যুগ্ম স্বাস্থ্য সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

(ফ) নির্বাহী সদস্য: আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে এমাম/চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় কমিটিতে যেকোন সময় যেকোন সংখ্যক নির্বাহী সদস্য মনোনয়ন দিবেন। নির্বাহী সদস্যগণ আন্দোলনের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ধারা-২৪) নির্বাচন/মনোনয়ন পদ্ধতি:

আল্লাহ একক ও চূড়ান্ত ক্ষমতাবলে (Absolute Sovereignty) আদমকে তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করলেন, মনোনীত করলেন, নির্বাচিত করলেন। কিন্তু এই আদমকে যারা বিবিধ পার্থিব জীবনোপকরণ সরবরাহ করে সেবা করবে, service দিবে, সহযোগিতা করবে সেই মালায়েকদের (ফেরেশতা) সঙ্গে কিন্তু তিনি পরামর্শ সভা ডাকলেন, তাদের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। সেখানে অনেক যুক্তি-তর্ক হলো। আদমের যোগ্যতা আল্লাহ যখন তাঁদের সামনে প্রমাণ করলেন, তখন তাঁরা আদমকে সেবা করতে সম্মত হলো। আল্লাহ জোর করে তাঁর ইচ্ছা মালায়েকদের উপর চাপিয়ে দেন নি। জবরদস্তি আল্লাহর নীতি নয়।

সমস্ত সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ পরিচালনা করেন তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাবলে। দুইজন হুকুমদাতা থাকলে সৃষ্টিজগতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। তেমনি একটি শক্তিশালী জাতির জন্য একটি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃপক্ষ দরকার, যার কথা চূড়ান্ত হবে। যিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা এবং তাঁর কথাকে সবাই মান্য করবে। যেকোন তর্ক-বিতর্কের অবসান হবে এখানে এসে। এটা একটি রাষ্ট্রের জন্য যেমন সত্য, তেমনি একটি আন্দোলনের জন্যও সত্য। ইসলামের আকিদা হচ্ছে জাতির একজন নেতা বা এমাম থাকবেন যিনি একাধারে জাতিকে জাগতিক

এবং আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে পরামর্শ, আদেশ, নির্দেশনা, উপদেশ সব দিবেন। ইসলামের নীতি হলো মুসল্লিদের সম্মতি ছাড়া কেউ নামাজের ইমামতি করতে পারে না। এটারই প্রতিফলন হবে তাদের সমাজে। মুসলিমদের সম্মতি ছাড়া কেউ তাদের নেতা বা এমাম হতে পারবে না।

কাজেই হেযবুত তওহীদের প্রত্যেকটি শাখায় সদস্যদের বা মোজাহেদ-মোজাহেদাদের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তাদের সমর্থিত ব্যক্তি, তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তি আন্দোলনের দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত হবেন। মহান আল্লাহর ইচ্ছাতে হারিয়ে যাওয়া সত্যকে ফের প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মাননীয় এমামুয্যামান এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমামুয্যামান যতদিন ছিলেন ততদিন তিনিই এই আন্দোলনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর সারাদেশের সদস্যদের লিখিত সম্মতিক্রমে বর্তমান এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম দায়িত্ব পালন করছেন। কোনো কারণে যদি আন্দোলন এমামশূন্য হয় তখন জরুরিভিত্তিতে সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যসহ জেলা কমিটির সভাপতিদের নিয়ে পরামর্শ করবেন। সেখানে কাকে আন্দোলনের এমাম হিসাবে মনোনীত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। আন্দোলনের জেলা কমিটিগুলোর সভাপতিবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ সম্মত হলেই 'এমাম' চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়ে যাবেন। যত দ্রুত সম্ভব সকলের পরামর্শক্রমে যিনি 'এমাম' হিসাবে মনোনীত হবেন তাঁর অনুকূলে আন্দোলনের সক্রিয় সদস্যগণ লিখিতভাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন।

ধারা-২৫) শাখাভিত্তিক কমিটি গঠন:

গ্রাম শাখায় হেযবুত তওহীদের যে সক্রিয় সদস্যরা রয়েছেন তারা ওয়ার্ড কমিটির কাছে তাদের পছন্দনীয় একজন ব্যক্তির নাম সভাপতি হিসাবে প্রস্তাব করবেন। ওয়ার্ড কমিটি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে উক্ত গ্রাম কমিটির সভাপতি হিসাবে কেন্দ্রের/কেন্দ্রের অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মনোনীত করবেন। গ্রাম কমিটির সভাপতি স্থানীয় ওয়ার্ড সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে। ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে একটি ওয়ার্ডের সকল গ্রাম সভাপতিবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলোচনাসাপেক্ষে তাদের পছন্দনীয় কোনো একজন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হিসাবে ইউনিয়ন কমিটির কাছে নাম প্রস্তাব করবেন। ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি কেন্দ্রের/কেন্দ্রের অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত ওয়ার্ডের সভাপতি মনোনীত করবেন। ওয়ার্ড সভাপতি স্থানীয় ইউনিয়ন সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে ওয়ার্ডের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন। এই প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে থানা/ উপজেলা কমিটি, জেলা কমিটি গঠিত হবে।

ধারা-২৬) নেতৃত্বের অযোগ্যতাঃ

পদের লোভে কেউ নেতৃত্বের আগ্রহ প্রকাশ করলে, আত্মপ্রচারণায় ব্যাপৃত হলে, নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতার মনোভাব প্রকাশ পেলে তিনি নেতৃত্বলাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পদে থাকা অবস্থায় কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অন্য কোনো উপায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, কিংবা আন্দোলনের নীতিমালা বা শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে পদচ্যুত করা হবে।

ধারা-২৭) উপদেষ্টা কমিটিঃ

আন্দোলনের সদস্য না হয়েও এর কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিভিন্ন উপদেশ, তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে সহযোগিতা করবেন তারা আন্দোলনের উপদেষ্টা হিসাবে বিবেচিত হবেন। তাদের উপদেশ ও পরামর্শ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটি বিবেচনা করবেন। এক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্য থেকেও উপদেষ্টা কমিটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

উপদেশ অত্যন্ত উত্তম একটা আমল হিসেবে পরিগণিত হয়, আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বার বার বলেছেন এটা উপদেশ গ্রন্থ। আল্লাহ বলেছেন, কালের শপথ! সবাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কেবল তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সঠিক ও উত্তম কাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপর অটল থাকার জন্য, দৃঢ় সংকল্প অবলম্বনের জন্য উপদেশ দেন (সুরা আসর)। নবী-রসুলরা শুধু আদেশই দেন নি, তাঁরা উপদেশও দিয়েছেন। উত্তম উপদেশ, উত্তম পরামর্শ উত্তম জাতি গঠনে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। তাই আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনায় যে কারো উত্তম পরামর্শ আমলে নিতে হেযবুত তওহীদ সদা প্রস্তুত। আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনায় পরামর্শ দেয়ার জন্য আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে উপদেষ্টা কমিটি থাকবে। কেউ হেযবুত তওহীদের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখতে চাইলে তাঁকে অবশ্যই আন্দোলনের যাবতীয় কার্যক্রম, লক্ষ্য-উদ্দশ্য, কর্মসূচি সবকিছু সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে, আন্দোলন সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-বুঝে সন্দেহমুক্ত হতে হবে। অতঃপর একটি নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে তিনি উপদেষ্টা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। এরকম বহু উপদেষ্টার সমন্বয়ে উপদেষ্টা কমিটি হবে, উপদেষ্টার সংখ্যা অনির্দিষ্ট থাকবে। উপদেষ্টা কমিটিতে একজন প্রধান উপদেষ্টা, একজন নির্বাহী উপদেষ্টা থাকবেন এবং অন্যান্যরা সদস্য হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা-২৮) সভাঃ

সকল স্তরের কমিটির সদস্যদেরই মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হওয়া বাধ্যতামূলক। তবে জরুরি কোনো প্রয়োজন পড়লে এমাম/চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করবেন। সভাপতির আহ্বানে যেকোন সময়ে বিভিন্ন স্তরের শাখার সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। এক্ষেত্রে কমিটির সদস্যদের তিনভাগের দুইভাগ

কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তা গৃহীত হতে পারে। সভায় বিগত কার্যাবলীর পর্যালোচনা, নতুন কার্যতালিকা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

ধারা-২৯) উপ-কমিটি:

নির্দিষ্ট বা বিশেষ কোনো কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কোনো কমিটি গঠন করা হলে তা উপ-কমিটি হিসাবে আখ্যায়িত হবে।

ধারা-৩০) আহ্বায়ক কমিটি:

যে এলাকায় হেযবুত তওহীদের এক বা একাধিক সদস্য বা পরিবার বসবাস করে এবং যেখানে আন্দোলনের পক্ষে কিছু ব্যক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন কিন্তু কমিটি গঠনের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয় নি সেখানে উপযুক্ত কোনো সদস্যকে আহ্বায়ক করে অস্থায়িভাবে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। পরে যখন কমিটি গঠনের অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে পাশাপাশি আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এছাড়াও যেকোন স্তরের কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হলে সাময়িকভাবে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা যাবে। তবে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হলে আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমাম/চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে যেকোন সময়ে যেকোন পর্যায়ের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা যাবে।

ধারা-৩১) শাখা কমিটি:

কেন্দ্রীয় কমিটির অনুরূপ/আদলে সমসংখ্যক (প্রয়োজনে কম বেশি হতে পারে) সম্পাদকমণ্ডলী নিয়ে সকল স্তরের শাখা কমিটি গঠিত হবে। উল্লেখ্য সকল স্তরের শাখা কমিটির প্রধান সভাপতি নামে অভিহিত হবেন এবং সাধারণ সম্পাদকসহ সকল সম্পাদকের সাথে শাখার নাম যুক্ত হবে।

ধারা-৩২) গঠনতন্ত্র সংশোধনী:

গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা-উপধারা, শব্দ বা লাইনের সংশোধন বা কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন হলে এমাম/চেয়ারম্যান মহাসচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ৫ (পাঁচ) জন এবং সদস্যদের মধ্য থেকে ২ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন। উক্ত কমিটি যাচাই বাছাই করে প্রস্তাবনা পেশ করবেন। উক্ত প্রস্তাবনা খসড়া আকারে জেলা কমিটির সভাপতিবর্গের নিকট প্রেরিত হবে। জেলা কমিটির সদস্যদের পরামর্শের পর তা লিখিত আকারে এমাম/চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরিত হবে এবং তার বিবেচনার পর গঠনতন্ত্রে প্রস্তাবিত পরিবর্তন আনা হবে।

পরিশিষ্ট

কর্মসূচির ব্যাখ্যা (ধারা- ১০ থেকে):

বিগত তেরশত বছরে ক্রমাগত বিকৃত হতে হতে আল্লাহর রসুলের প্রকৃত ইসলাম বর্তমানে একেবারে বিপরীত একটি ধর্ম-বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এই ইসলাম বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে আল্লাহর রসুলের ইসলামের মতো হলেও চরিত্রে, আত্মায় ঠিক এর বিপরীত। শেষ রসুল আনীত প্রকৃত ইসলাম মানুষকে দিয়েছিল সর্বরকম মুক্তি ও স্বাধীনতা, নির্মূল করেছিল সমস্ত অন্যায়-অবিচার, সামাজিকভাবে দিয়েছিল পরম নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দূর করেছিল বৈষম্য। কিন্তু বর্তমানে সে ইসলাম আর আমাদের মাঝে নেই। ধর্মব্যবসায়ী ও পণ্ডিতদের কবলে পড়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলাম আজ অন্যান্য ধর্মের মতো নামাজ রোজাসর্বস্ব একটি ধর্মে পরিণত হয়ে গেছে। সর্বশেষ ব্রিটিশরা তাদের তৈরি মাদ্রাসাশিক্ষার মাধ্যমে এই জাতির মন-মগজে এক মৃত ইসলাম গেড়ে দিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এই জাতিকে যদি পৃথিবীর বুকে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়, সম্মান নিয়ে বাঁচতে হয়, শান্তি ও সমৃদ্ধ পৃথিবী পেতে হয় এবং মৃত্যুর পরে জান্নাতে যেতে হয় তাহলে আল্লাহ ও রসুলের প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। সেই প্রকৃত ইসলাম যামানার এমাম, এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন। এখন মানবজাতির কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া সত্য ইসলামটাকে মেনে নেওয়া। এ ছাড়া মানবজাতির সামনে অন্য কোনো পথ অবশিষ্ট নেই।

এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর দেওয়া কর্মসূচি অপরিহার্য। আল্লাহ একটি জীবনব্যবস্থা দিলেন অথচ সেটি প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি তিনি দিবেন না, মানুষ সেটা নিজে রচনা করে নেবে তা কখনোই হতে পারে না। আল্লাহর রসুল (স.) এবং তাঁর উম্মাহ কি অর্ধপৃথিবীতে নিজেদের তৈরি কর্মসূচি দিয়ে দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কোথায় সেই কর্মসূচি? মহান আল্লাহ অসীম করুণা করে, ভালোবেসে তাঁর নিজের তৈরি করা সেই পবিত্র কর্মসূচি এ যামানার এমামকে নতুন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার রসুলকে সঠিক পথ প্রদর্শন (হেদায়াহ) এবং সত্য দীন (জীবনব্যবস্থা) দিয়ে প্রেরণ করলাম এ জন্য যে তিনি যেন একে (এই হেদায়াহ ও জীবনব্যবস্থাকে) পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন (সুরা ফাতাহ- ২৮, সুরা তওবা- ৩৩ ও সুরা সফ- ৯)। অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর রসুলকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর প্রেরিত সত্য দীনকে বিজয়ী করে ন্যায়, সুবিচার, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীময় এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যেহেতু রসুলের একার পক্ষে এক জীবনে সম্ভব নয়, তাই এর জন্য তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই একটি জাতি গঠন করতে হলো। আর এই জাতিকে তার লক্ষ্যে স্থির রাখার জন্য একটি কর্মসূচিও অপরিহার্য। এই কর্মসূচিও আল্লাহ নিজেই দিয়ে দিলেন, যেখানে তিনি মো'মেন জাতির কিছু অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে দিলেন। এই কর্মসূচি ব্যতীত মো'মেনরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এমনকি রসুলের ভাষায় এই কর্মসূচি থেকে এক বিঘত পরিমাণ (সামান্য পরিমাণ) সরে যাওয়ার মানে হচ্ছে নিজের গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলা অর্থাৎ দীন থেকে বহিষ্কৃত হওয়া। আল্লাহর দেওয়া এই কর্মসূচি আমরা পাই রসুলের একটি হাদীস থেকে।

আল্লাহর রসুলে বলছেন, "আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন। তা হলো-

(১) ঐক্যবদ্ধ হও।

(২) (নেতার আদেশ) শোন।

(৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন কর।

(৪) হিজরত কর।

(৫) আল্লাহর রাস্তায় (সত্যের পথে) সংগ্রাম কর।

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হল, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু (বন্ধন) খুলে ফেলল- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের (কোনও কিছুর) দিকে আহ্বান করলে, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামাজ পড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

দুর্ভাগ্যবশত বিশ্বনবীর ওফাতের ৬০/৭০ বছর পর ইবলিস এই উম্মাহর আকীদায় বিকৃতি ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হলো। যার ফলে এই জাতি সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং ওই ৫ দফা কর্মসূচি দু'টোই ত্যাগ করে ইসলাম ও উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেল। সেই থেকে এই কর্মসূচি যে পরিত্যক্ত হয়েছিল এই তেরশ' বছর ওটা পরিত্যক্ত হয়েই ছিল। হাদীসের বইগুলোতে কর্মসূচির ওই হাদীসটি যথাস্থানেই আছে। এই তেরশ' বছরে এটি লক্ষ-কোটিবার পড়া হয়েছে, পড়েছেন লক্ষ লক্ষ আলেম, ফকিহ, মুফাসসের, মোহাদ্দেস, শায়েখ, দরবেশরা, কিন্তু

বোঝেন নি যে এটি এই উম্মাহর জন্য স্রষ্টার দেয়া একমাত্র কর্মসূচি-তরিকা। গত কয়েক শতাব্দিতে এই দীনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় বহু মুসলিম দেশে শত শত দল, আন্দোলন, সংগঠন করা হয়েছে, কিন্তু আকীদার বিকৃতির কারণে আল্লাহ তাদেরকে ঐ কর্মসূচি বুঝতে দেন নি। ফলে ওই সংগঠনগুলো বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন দফার কর্মসূচি নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে। কোথাও কেউ সাফল্য লাভ করে নি, পৃথিবীর এক ইঞ্চি জমিতেও তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। কারণ তাদের সবার কর্মসূচিই মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত, আল্লাহর দেয়া নয়। ফলে তাদের ঐ প্রচেষ্টায় আল্লাহর কোনো সাহায্য আসে নি। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর রসুলও সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না।

আল্লাহর দেয়া এই ৫ দফা কর্মসূচির ব্যাখ্যা

প্রথম দায়িত্ব - ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

ঐক্য ছাড়া কোনো অভীষ্ট, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। কোনো জাতি বা রাষ্ট্র ধনবলে, লোকবলে, সামরিক বলে যতই শক্তিশালী হোক সেটা তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে না, বরং তারচেয়ে অনেক দুর্বল অথচ ঐক্যবদ্ধ এমন শত্রুর কাছে তারা পরাজিত হবে। যেমন বর্তমান মুসলিম নামক জনসংখ্যা। এ জন্যই আল্লাহ তাঁর কোর'আনে বারবার সুদৃঢ় ঐক্যের কথা বলেছেন, সুরা আল ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন- তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ শক্ত করে আল্লাহর রজ্জু (হেদায়াহ, দীন) ধরে রাখ এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সুরা সফ-এর ৪ নং আয়াতে আবার বলেছেন, 'আল্লাহ তাদেরকে কতই ভালোবাসেন যারা গলিত সীসার প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে।' যে সব কাজে ও কথায় উম্মাহর ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে যেমন মতভেদ, গীবত ইত্যাদি সে সব কাজকে আল্লাহর রসুল সরাসরি কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানে ১৫০ কোটির মুসলিম নামধারী জনসংখ্যাটি বহু ভৌগোলিক রাষ্ট্রে, রাজনৈতিকভাবে বহু মতাদর্শে বিভক্ত। ধর্মীয়ভাবে বহু ফেরকা, মাজহাব, আধ্যাত্মিকভাবে শত শত তরিকায় ছিন্নভিন্ন। আজ একমাত্র হেযবুত তওহীদ এই শতধাবিচ্ছিন্ন মানবজাতিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মহাজাতিতে পরিণত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দায়িত্ব - (নেতার আদেশ) শোনা অর্থাৎ শ্রবণ করা।

এটি একটি আরবি বাগধারা বা প্রকাশভঙ্গি। এর দ্বারা অতি সতর্কতার সাথে কোনো বিষয়ে সদা, সর্বদা সচেতন হয়ে থাকা বোঝায়। এখানে এই সচেতনতা হচ্ছে দু'টি বিষয়ে। একটি নেতার আদেশ শোনার প্রতি সদা সর্বদা কান খাড়া করে

রাখা, নেতার কখন কি আদেশ হয় তা তৎক্ষণাৎ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং অপরটি নিজেদের শৃংখলা অটুট রাখা। শৃংখলা শব্দটি এসেছে শৃংখল অর্থাৎ শেকল থেকে। শৃংখলাবদ্ধ অর্থাৎ নিজেকে শেকল দিয়ে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এই শেকল হচ্ছে কতগুলি নিয়মকানুন, নির্দেশ ইত্যাদি। শৃংখলাবদ্ধ অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে Disciplined হওয়া এবং সেইগুলি সতর্কভাবে যথারীতি পালন করা হচ্ছে শোনা, অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে শৃংখলা অর্থাৎ নিয়মনীতি পালন করার নির্দেশ থাকে সে সম্বন্ধে সদা সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকা এবং সেই মোতাবেক কাজ করা। এ থেকে বিচ্যুতিকেই, এই সচেতনতার অভাবকেই কোর'আনে আল্লাহ গাফেলতি বলেছেন। রসুলাল্লাহ মো'মেনের শৃংখলাবদ্ধ জীবনের উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন, "মো'মেন ব্যক্তির উপামা হচ্ছে নাকের ছিদ্রে রশি লাগানো উটের মত। যে দিকেই তাকে টানা হয় সেদিকে সে যেতে বাধ্য (হাদিস, এবনে মাজাহ, বাবু ইত্তিবাহ সুন্নাতে রসুলাল্লাহ)।"

মানবজাতিকে সত্যিকারভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি অপরিহার্য তা হলো, তাদেরকে একক নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসা, এতে করে সকলেই একই নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হবে। সৃষ্টিজগতে যেমন বিধাতা একজন হওয়ায় কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, তেমনি সমগ্র মানবজাতিতে যখন একজন মাত্র নেতা থাকবেন যিনি হবেন হেদায়াতপ্রাপ্ত-ন্যায়পরায়ণ তখন মানবসমাজেও প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বপ্রকৃতির ন্যায় অতুলনীয় শৃঙ্খলা, সঙ্গতি ও সমন্বয় (Discipline, order & harmony)।

তৃতীয় দায়িত্ব - (নেতার ঐ আদেশের) আনুগত্য করা।

কর্মসূচির অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আনুগত্য। এই দীনে আনুগত্য হলো আদেশ শোনামাত্র বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে সে আদেশ পালন করা। আনুগত্য হচ্ছে একটি পরিবার, গোষ্ঠী বা জাতির মেরুদণ্ড, এটা যেখানে দুর্বল সেখানেই অক্ষমতা এবং ব্যর্থতা। এ নির্দেশ শুধু রসুলেরই নয়, এ নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহর। তিনি কোর'আনে মো'মেন, উম্মতে মোহাম্মদীকে আদেশ করেছেন– আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর রসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে আদেশকারীর (নেতার) আনুগত্য কর (সুরা নেসাঃ ৫৯)।

আনুগত্য হচ্ছে শান্তির মূলমন্ত্র, আল্লাহর আনুগত্যই ইসলাম, ইসলাম মানেই শান্তি। আজকের পৃথিবীতে কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যখনই তার জাতিকে কোনো আদেশ বা বিধান দেন, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এর বিরুদ্ধাচরণ ও সমালোচনা। কিন্তু ইসলামের বেলায় আল্লাহর কোনো আদেশের ব্যাপারে মতান্তর বা বিরোধিতার প্রশ্ন অবান্তর তেমনি আল্লাহর রসুলের নির্দেশ হচ্ছে, 'কোনো ক্ষুদ্রবুদ্ধি, কান কাটা, নিগ্রো, ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা নিয়োজিত হয়, তবে তার কথা বিনা

প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় শুনতে ও মানতে হবে।' কারণ নেতার আদেশ প্রকারান্তরে আল্লাহরই আদেশ।

চতুর্থ দায়িত্ব - হিজরত

হিজরত শব্দের অর্থ কেবল 'দেশ ত্যাগ করা' নয়। ইসলামি বিশ্বকোষের পরিভাষায় হিজরত শব্দের অর্থঃ- "সম্পর্কচ্ছেদ করা, দল বর্জন করা, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে গমন করা" (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৬০-৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। আল্লাহয় বিশ্বাসী অথচ মোশরেক আরবদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বনবী যখন প্রকৃত তওহীদের ডাক দিলেন তখন যারা তাঁর সাথে যোগ দিলেন তারা আরবদের ঐ শের্ক ও কুফর থেকে হিজরত করলেন। তারা মোশরেক কাফেরদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, ওঠা-বসা সবই করতেন কিন্তু তাদের মধ্যে বাস করেও হৃদয়ের দিক থেকে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, তাদের দল বর্জন করলেন, তাদের সাথে ইবাদত করা ছেড়ে দিলেন। জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই হিজরত অর্থাৎ সম্পর্ক ত্যাগ, দল বর্জন প্রত্যেক নবী-রসুল ও তাঁদের সঙ্গীরা করে গেছেন। আজকের যুগেও যাবতীয় মিথ্যা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করবে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যারা সংগ্রাম করবে, তাদেরকেও সর্বাগ্রে সমাজে বিরাজমান যাবতীয় অন্যায় আর অসত্য থেকে নিজেদেরকে আলাদা করতে হবে, হিজরত করতে হবে। অন্যায়ের ধারকদের দলভুক্ত থেকে কেউ সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। তাই হেযবুত তওহীদও সমাজে ধর্মের নামে বিরাজমান অধর্ম, রাজনীতির নামে বিরাজমান সন্ত্রাস-হানাহানি, ফেরকা-মাজহাবের নামে বিরাজমান অনৈক্য, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ইত্যাদি যাবতীয় অন্যায় থেকে এবং সেই অন্যায়কারীদের থেকে হিজরত করেছে। বর্তমানে সারা পৃথিবী দাজ্জাল তথা ইহুদি-খ্রিষ্টান আত্মাহীন বস্তুবাদী সভ্যতার পদতলে। এখানে এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে গিয়ে লাভ নেই। সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে হরণকারী এই দাজ্জালের করতলে থেকেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে হেযবুত তওহীদকে।

পঞ্চম দায়িত্ব - আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করা।

কর্মসূচির প্রথম চারটি দায়িত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই হল আল্লাহর দেওয়া সত্য দীনকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম তথা জেহাদ করা। এই সংগ্রামের একজন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে যে চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য সেগুলোই হচ্ছে প্রথম চার দফা। এই সংগ্রামই যদি হারিয়ে যায় তবে পূর্বোক্ত চার দফার কোনো মূল্য থাকে না। ইসলামে এই সংগ্রামের স্থান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে কোর'আনে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা তওহীদের পর এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আয়াত নাজিল হয়েছে। এমনকি একেবারে মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যেই একে আল্লাহ অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও তাঁর

রসুলের উপর, অতঃপর কোনো সন্দেহ পোষণ করে না (তার বিশ্বাসে স্থির থাকে) এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই কেবল সত্যনিষ্ঠ মো'মেন।" (সুরা হুজরাত- ১৫)

আজকে অনেকে জেহাদ বলতে সশস্ত্র যুদ্ধের কথাই বুঝে থাকেন। কিন্তু জেহাদ মানেই সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, বরং সশস্ত্র যুদ্ধ বোঝাতে আল্লাহ কোর'আনে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'কেতাল'। এই কেতালও জেহাদেরই অংশ, জেহাদের চূড়ান্ত পর্যায়। কিন্তু সেটা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের কাজ নয়। সশস্ত্র সংগ্রাম কেবল রাষ্ট্রের কাজ। আল্লাহর রসুল (স.) মদীনায় রাষ্ট্র গঠন ও সেই রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো দিন সশস্ত্র যুদ্ধ অর্থাৎ কেতাল করেন নি। কিন্তু জেহাদ তথা সংগ্রাম শুরু হয়েছে নব্যুওয়াত প্রাপ্তির অব্যবহিত পর থেকেই। শত নির্যাতন-নিপীড়ন আর বাধার মুখে তিনি ও তার সঙ্গীরা সীমাহীন ত্যাগ আর ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সত্য প্রচারে সংগ্রাম করে গেছেন। আজকে হেযবুত তওহীদও একইভাবে আল্লাহর দীনের প্রকৃত রূপটি মানুষের সামনে তুলে ধরছে। এই কাজ করতে গিয়ে এই আন্দোলনের সদস্যরা সীমাহীন নির্যাতন, অপবাদ, মিথ্যাচার, হয়রানির শিকার হচ্ছে। সংগ্রাম করতে করতে তারা অনেকে নিঃস্ব হয়ে গেছে। আন্দোলনের বহু সদস্যকে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়েছে, এমনকি বেশ কয়েকজনকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হেযবুত তওহীদের সংগ্রাম থেমে থাকে নি। রাষ্ট্রের সকল আইন মান্য করেই এই আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছে নতুন এক সমাজ নির্মাণের আশায়, যাবতীয় মিথ্যা অপসারিত হয়ে আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

দীর্ঘ তেরশ' বছর এই উম্মাহকে এই পবিত্র কর্মসূচি থেকে মাহরুম, বঞ্চিত রাখার পর রাহমানুর রহিম আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় তাঁর দেয়া কর্মসূচির পরিচয় মাননীয় এমামুয্যামানকে বোঝার তওফিক দান করেছেন।

হেযবুত তওহীদের প্রতীকের ব্যাখ্যা (ধারা ১১ থেকে):

হেযবুত তওহীদের প্রতীকটির মধ্যে পাঁচটি অংশ রয়েছে যা হেযবুত তওহীদের কর্মসূচির পাঁচটি দফার প্রতিনিধিত্ব করে। পাঁচটি অংশ হচ্ছে যথাক্রমে কাবা, রওজা মোবারক, কোর'আন, হেযবুত তওহীদের নাম ও তরবারি।

১. কাবা: কাবা হচ্ছে ঐক্যের প্রতীক। আকীদাগতভাবে বা ধারণাগতভাবে সমস্ত মানবজাতি মূলত এক জাতি। তাদের উৎস এক। তারা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। তারা একই পিতামাতা আদম-হাওয়ার সন্তান। কালক্রমে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ভৌগোলিক এবং আবহাওয়াগত কারণে তাদের রঙ ভাষা ইত্যাদিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারা মূলত একজাতি। এই একক জাতিসত্তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে, হাশরের দিনে সবার একত্রিত সমাবেশকে

স্মরণ করিয়ে দিতে এবং মানবজাতিকে চূড়ান্তরূপে সত্যের পক্ষে ন্যায়ের পক্ষে

ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ একটা জায়গা নির্ধারণ করে দেন। সেই জায়গা হল পবিত্র কাবা। এটা হল সমস্ত মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জায়গা। মুসলিম নামক জাতিটি বর্তমানে শতধাবিচ্ছিন্ন হলেও তারা প্রত্যেকে সেই কাবার দিকে ফিরেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ (নামাজ) কায়েম করে এবং বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের সামর্থবান ব্যক্তিরা হজ্বের উদ্দেশে সেখানে একত্রিত হয়ে কাবাকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করে। হেযবুত তওহীদ সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে অর্থাৎ ন্যায়ের পক্ষে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত কর্মসূচির প্রথম দফাটিই হচ্ছে এই ঐক্য। হেযবুত তওহীদের প্রতীকের কাবা এই মহোত্তম ঐক্যকেই নির্দেশ করে।

২. রসুলাল্লাহর রওজা মোবারকের উপরে অবস্থিত গম্বুজ, যা রসুলাল্লাহকে নির্দেশ করছে। রসুল পাক (দ.) আল্লাহর হুকুম মোতাবেক উম্মতে মোহাম্মদী নামক জাতিটিকে তৈরি করেছেন। আল্লাহর হুকুমগুলোকে কীভাবে মানবসমাজে বাস্তবায়ন করা হবে তার নিয়ম শৃঙ্খলা রসুলাল্লাহ দেখিয়েছেন। কাজেই রসুলুল্লাহ (স.) হচ্ছেন উম্মাহর সজাগতা, সতর্কতা ও শৃঙ্খলার প্রতীক, তিনিই সর্বোত্তম অনুকরণীয় অনুসরণীয় আদর্শ। জাতি প্রথমে ঐক্যবদ্ধ হবে তওহীদের উপর, ন্যায়ের পক্ষে। ঐক্যবদ্ধ হবে একটি লক্ষ্য নিয়ে আর সেটা হলো পৃথিবীময় মানবজাতির জীবনে তওহীদের মাধ্যমে শান্তি, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতির মধ্যে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। আল্লাহর রসুল কঠোর শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর উম্মাহর চরিত্রে যে গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন সেগুলো হচ্ছে এমন-

ক. তাঁর উম্মাহ প্রতিটি উপদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

খ. তারা হবে বাধ্য, নিয়ন্ত্রিত এবং নিয়মানুবর্তী।

গ. তারা তাদের মন্দ বা ভুল কাজের জন্য হবে অনুতপ্ত, মর্মযন্ত্রণায় কাতর এবং প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য থাকবে সদা প্রস্তুত।

ঘ. তারা তাদের সকল কাজের সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিকল্পনা করবে এবং সমস্তকিছু থাকবে সাজানো-গোছানো।

ঙ. তারা শাসন করবে, শাস্তি দিবে।

এই গুণগুলো দিয়ে রসুলের উম্মাহ থাকবে শৃঙ্খলিত।

৩. পবিত্র কোর'আন, যার উপর কোর'আনুল হাকিম কথাটি লিখিত রয়েছে। কোর'আন হল আল্লাহর হুকুমসমূহের সমষ্টি। এই দীনের যাবতীয় হুকুমের, বিধানের মূল ভিত্তি হল কেবল আল্লাহর হুকুম মান্য করার অঙ্গীকার তথা তওহীদ। আল্লাহর সেই হুকুমগুলো, দীনের মূলনীতিগুলো বিধৃত হয়েছে কোর'আনে। এই হুকুমগুলোর আনুগত্য, নীতিগুলোর অনুসরণই হচ্ছে ইসলাম। এজন্য হেযবুত তওহীদের কর্মসূচির তৃতীয় ধারা হচ্ছে আনুগত্য আর প্রতীকের তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে কীসের আনুগত্য করতে হবে তার প্রতীক কোর'আন।

৪. হেযবুত তওহীদ। আল্লাহর রসুল (স.) যে দীন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন প্রায় চৌদ্দশ' বছরের ব্যবধানে তা বিকৃত হতে হতে আজকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী একটি আমলসর্বস্ব ধর্মে পরিণত হয়েছে। মুসলিম নামধারী দেড়শ' কোটির অধিক এই জাতি আল্লাহ রসুলের প্রকৃত আদর্শ থেকে বহু দূরে সরে গেছে। কীভাবে দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছরের কাল পরিক্রমায় রসুলের প্রকৃত ইসলাম বিকৃত হয়ে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গেল সেই জ্ঞান এবং ইসলামের প্রকৃত রূপ আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় মহামান্য এমামুয্যামানকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি সেই প্রকৃত ইসলামের জ্ঞানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হেযবুত তওহীদ আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাজেই হেযবুত তওহীদ প্রচলিত বিকৃত ইসলামকে বয়কট করেছে, সকল অন্যায় ও বিকৃতি থেকে হিজরত করেছে। তাই হেযবুত তওহীদ নিজেই মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান তথা হিজরতের প্রতীক।

৫. তলোয়ার। তলোয়ার হচ্ছে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক, জেহাদের প্রতীক। যুগে যুগে যখন কোনো সমাজে জুলুম রক্তপাত মহামারী আকার ধারণ করে তখন সে অন্যায় অবিচার দূর করার জন্য একদল সত্যনিষ্ঠ মো'মেনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক। সেই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা মৌখিক প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পর্যায়ে শক্তি প্রয়োগ পর্যন্ত হতে পারে। তবে শক্তি প্রয়োগ কেবল রাষ্ট্রশক্তির কাজ। ব্যক্তি এবং দলগত পর্যায়ে শক্তি প্রয়োগ সম্ভব নয়।

প্রতীকের এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যেই হেযবুত তওহীদের কর্মসূচি ও আদর্শকে প্রকাশ করা হয়েছে।

ধারা ১৯ঃ গ থেকে (১)ঃ সক্রিয় সদস্যের অঙ্গীকারনামাঃ

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অঙ্গীকার পত্র

১. আমি এ আন্দোলনের অন্যান্য সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে ইস্পাতের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকব। ঐক্য নষ্ট হয় এমন কোনো কথা বলব না বা কাজ করব না। কোনো ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করব না। মতভেদের কোনো কারণ উঠলেই চুপ হয়ে যাব এবং ঐ ব্যাপারে কোনো কথা না বলে নেতার সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেব এবং তারপর নেতার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেলে জান-মাল কোরবানি করে হলেও সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করব। আমি বিশ্বাস করব যে, এ আন্দোলনের অন্যান্য সদস্য-সদস্যারা আমার ভাই-বোন, তারা আমার রক্তের সম্পর্কের চেয়েও আপন।

২. নেতা কখন কোন্ আদেশ নির্দেশ দেন সে জন্য আমি সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকব।

৩. নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। নেতা কোনো আদেশ দিলে পছন্দ বা অপছন্দ হোক, সঠিক বা ভুল মনে হোক, বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে সে আদেশ পালন করব। তাতে সম্পত্তির ক্ষতি হয় হোক, জান যায় যাক বা থাক, কিছুরই পরওয়া করব না। শুধুমাত্র ফরদে আইনের বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোনো আদেশ অমান্য করব না। নেতার আদেশ হলে সুন্নাহ-নফল এবাদত স্থগিত রাখব। নেতা একবার নিয়োজিত হয়ে গেলে তিনি যোগ্য কি অযোগ্য দেখব না; তার আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করব। বিপদ আপদের, ঝড়-বৃষ্টির কোনো পরওয়া করব না।

৪. আমি বিশ্বাস করব যে, আমি নিজে এবং এ আন্দোলনের অন্যান্য সদস্য-সদস্যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সঠিক আকিদায়, সঠিক পথে,

সঠিক দিক নির্দেশনায়, সেরাতুল মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছি। এই হেদায়াতে যারা নেই, অর্থাৎ বাকী দুনিয়ার সমস্ত মানুষ থেকে আমি ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। ওদের মধ্যে বাস করলেও আমি ওদের একজন নই। আকিদার বিকৃতি ও হেদায়াতের অভাবের কারণে ওরা আল্লাহ-রসুলকে বিশ্বাস করে সালাহ্ (নামাজ), সওম (রোযা), হজ্ব, যাকাত ও বহু নফল এবাদত করে গেলেও ওগুলো কোনো কাজে আসবে না। আমি তাদের সাথে কোনো এবাদত করব না। আমি এবাদত করব শুধু এই আন্দোলনের ভাই ও বোনদের সঙ্গে। আমি বর্তমানের বিকৃত ইসলাম থেকে হেজরত করলাম। আমি কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেব না।

৫. আমি সর্বদা মনে রাখব যে উপরের ঐ ঐক্য, ঐ শৃংখলা, ঐ আনুগত্য, ঐ হেজরতের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকীম অর্থাৎ প্রকৃত দীনুল হক, দীনুল কাইয়্যেমাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জেহাদ; এবং একথাও মনে রাখব যে ঐ ঐক্য, ঐ শৃংখলা, ঐ আনুগত্য, ঐ হেজরতের যে কোনো একটি দুর্বল হয়ে গেলে জেহাদে আর বিজয় সম্ভব নয়। আরও মনে রাখব, আল্লাহর রসুল বলেছেন, যে বা যারা ঐ ঐক্য, ঐ শৃংখলা, ঐ আনুগত্য, ঐ হেজরত ও জেহাদের এই পাঁচ দফা কর্মসূচির ভ্রাতৃত্বের বন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্যুত হবে বা সরে যাবে, তার বা তাদের গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে যাবে, যদি না সে তওবা করে আবার এই কর্মসূচির বন্ধনে ফিরে আসে এবং যে বা যারা অন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ডাক দেয়, সে বা তারা নিজেদের যত বড় মুসলিমই মনে করুক, যত সালাহ্ (নামায) পড়ুক ও যত সওম (রোযা) রাখুক, যত এবাদতই করুক, তারা জাহান্নামের জ্বালানী পাথরে পরিণত হবে।

স্বাক্ষর .... তারিখ .... স্থানীয় আমিরের নাম ও স্বাক্ষর ....

নাম.. বয়স..............

পিতা/স্বামীর নাম..

বর্তমান ঠিকানা..

....

স্থায়ী ঠিকানা..

....

পেশা.............................. শিক্ষাগত যোগ্যতা........................

পূর্ব অভিজ্ঞতা..

মোবাইল নম্বর..

বর্তমান ইউনিট ও শাখা..

কোন বিষয়ে পারদর্শী/উৎসাহী..

....

কিভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন: বই পড়ে/ব্যক্তির মাধ্যমে [টিক (✓) দিন]

ব্যক্তির নাম..

ঠিকানা..

....

যোগদানকারীর স্বাক্ষর.............................. তারিখ....................

আমিরের নাম ও স্বাক্ষর..

ধারা ১৯ঃ গ থেকে (২)ঃ সদস্যদের অঙ্গীকারনামাঃ

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হেযবুত তওহীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে আমাদের অঙ্গীকার

আমি/আমরা সকল প্রকার অন্যায়, অসত্য, ধর্মব্যবসা, অপরাজনীতি, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইস্পাতের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকব। ঐক্য নষ্ট হয় এমন কোনো কথা বলব না, এমন কোনো কাজ করব না, কাউকে করতেও দেব না। কোনো ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করব না, মতভেদ করব না। মতভেদের কোনো কারণ উঠলেই চুপ হয়ে যাব এবং বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেব। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারী সকলেই আমরা ভাইবোন; এ ঐক্য রক্ষার্থে আমরা সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকব। আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ হবে সুশৃঙ্খল। কারণ শৃঙ্খলা ব্যতীত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি আমরা গঠন করতে পারব না এবং যে মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সংগ্রাম করছি তা শৃঙ্খলা ছাড়া কখনোই অর্জিত হবে না। আমরা নেতার সকল কথার নিঃশর্ত আনুগত্য করব। যেহেতু সকল ধর্মেই ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ, তাই ধর্মব্যবসায়ীদের অনুসরণ করব না। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সত্যের পক্ষে মানবতার কল্যাণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

স্বাক্ষর .... তারিখ .... স্থানীয় আমিরের নাম ও স্বাক্ষর ....

নাম.. বয়স..........

পিতা/স্বামীর নাম..

বর্তমান ঠিকানা..

.... বর্তমান ইউনিট ও শাখা (থানা/জেলা)..

স্থায়ী ঠিকানা..

....

পেশা.................. শিক্ষাগত যোগ্যতা.................. পূর্ব অভিজ্ঞতা..................

মোবাইল নম্বর.................. যোগদানকারীর স্বাক্ষর.................. তারিখ..........

আমিরের নাম.................. স্বাক্ষর..................

ধারা ১৯ঃ গ থেকে (৩)ঃ কমিটির প্রধানদের অঙ্গীকারনামাঃ

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কমিটি প্রধানদের উপর হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারনামা

আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমি বিশ্বাস করি হেযবুত তওহীদ আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আন্দোলন। কাজেই এই দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানতস্বরূপ। আমি আমার জীবন এবং সম্পদকে মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করব এবং আন্দোলনের মাননীয় এমাম ও ঊর্ধ্বতন আমিরের বা সভাপতির নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করব। আন্দোলনের শৃঙ্খলা ও নীতির পরিপন্থী কোনো কাজ আমি করব না। আমি যদি শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো কাজ করি তাহলে যে কোনো সাংগঠনিক শাস্তি আমি মাথা পেতে নিতে বাধ্য থাকব। আমার কাজের দ্বারা যদি আন্দোলনের কোনো ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিপূরণ দিতে আমি বাধ্য থাকব। আল্লাহ আমাকে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের তওফীক দান করুন।

স্বাক্ষর .... তারিখ .... স্থানীয় আমিরের নাম ও স্বাক্ষর ....

নাম .... বয়স ....

পিতা/স্বামীর নাম ....

বর্তমান ঠিকানা ....

.... বর্তমান ইউনিট ও শাখা (থানা/জেলা) ....

স্থায়ী ঠিকানা ....

....

পেশা ও পদবি ....

মোবাইল নম্বর .... স্বাক্ষর .... তারিখ ....

আমিরের নাম .... আমিরের স্বাক্ষর ....

ধারা ১৯ঃ গ থেকে (৪)ঃ উপদেষ্টাবর্গের সম্মতিপত্রঃ

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হেযবুত তওহীদের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের সম্মতিপত্র

আমি হেযবুত তওহীদের কর্মকাণ্ডকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তাদের বই-পুস্তক পড়েছি, জেনেছি, বুঝেছি। আমি মনে করি যে, হেযবুত তওহীদ যদি তার লক্ষ্যে ঠিক থাকে তাহলে তাদের দ্বারা মানবতার বিশেষ কল্যাণ অবশ্যই সাধিত হবে। তাই হেযবুত তওহীদের চলমান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসাবে আমি আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে পরামর্শ প্রদান করতে সম্মত আছি। আমার কোনো পরামর্শ যদি কোনো কারণে তাদের দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয় আমি তাতে কোনোরূপ মনক্ষুণ্ন হবো না বা ওজর আপত্তি করব না।

স্বাক্ষর .... তারিখ ....স্থানীয় আমিরের নাম ও স্বাক্ষর ....

নাম.. বয়স..............

পিতা/স্বামীর নাম..

বর্তমান ঠিকানা..

.... বর্তমান ইউনিট ও শাখা (থানা/জেলা)....................

স্থায়ী ঠিকানা..

....

পেশা ও পদবি..

মোবাইল নম্বর.................................... স্বাক্ষর.......................... তারিখ..........................

আমিরের নাম.................................... আমিরের স্বাক্ষর....................................

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

(ক) দৈনিক বজ্রশক্তি (www.bajroshakti.com)

(খ) ইলদিরিম মিডিয়া

(গ) জেটিভি অনলাইন (www.jatiyatv.com)

(ঘ) বাংলাদেশেরপত্র.কম (www.bangladesherpatro.com)

(চ) তওহীদ কাবাডি দল

(ছ) তওহীদ ফুটবল ক্লাব

(জ) তওহীদ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী

হেযবুত তওহীদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি

১. ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
২. ইসলামের প্রকৃত সালাহ্ - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
৩. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান 'সভ্যতা'! - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
৪. The Lost Islam – Emamuzzaman (The Leader of the Time) Mohammad Bayazeed Khan Panni
৫. Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'! (অনুবাদ)
৬. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
৭. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
৮. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
৯. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
১০. যুগসন্ধিক্ষণে আমরা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
১১. বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ) - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
১২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী
১৩. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) এর ভাষণ (রিয়াদুল হাসান সম্পাদিত)
১৪. ইসলাম শুধু নাম থাকবে (সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন)
১৫. যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান (প্রচারপত্র সংকলন)
১৬. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন)

১৭. আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই

১৮. সন্মার্গ

১৯. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (সংক্ষিপ্ত)

২০. চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা

২১. Divide and Rule: শোষণের হাতিয়ার - হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

২২. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব - হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

২৩. দান: ইসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি- এম.আমিনুল ইসলাম

২৪. আসমাউ আত্তাবেয়্যু - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

২৫. ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

২৬. ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের যোগফল জঙ্গিবাদ; উত্তরণের একমাত্র পথ - হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

২৭. ধর্মবিশ্বাস: একটি বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান (একটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিপাদ্য)

২৮. শ্রেণিহীন সমাজ সাম্যবাদ প্রকৃত ইসলাম (বড়) (সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন)

২৯. শ্রেণিহীন সমাজ সাম্যবাদ প্রকৃত ইসলাম (ছোট) (সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন)

৩০. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াই (একটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিপাদ্য)

৩১. তাকাওয়া ও হেদায়াহ - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

৩২. আকিদা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

৩৩. সওমের উদ্দেশ্য - হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

৩৪. সম্মানিত আলেমদের প্রতি - হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

৩৫. সাংবাদিকতার আদর্শলিপি - ইয়াসিন হোসেন পাভেল ও রিয়াদুল হাসান

৩৬. আক্রান্ত দেশ আক্রান্ত ইসলাম - হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

৩৭. পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়- হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

৩৮. রাজধানী সূত্রাপুরে হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম প্রদত্ত ভাষণ

৩৯. ইসলাম কেন আবেদন হারাচ্ছে? - হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

৪০. তওহীদ জান্নাতের চাবি -হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

৪১. প্রিয় দেশবাসী (সংকলগ্রন্থ)

৪২. ধর্মের অপব্যবহার প্রগতির অন্তরায় (সংকলগ্রন্থ)

হেযবুত তওহীদ কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ও অন্যান্য ভিডিও সামগ্রী

১. একজাতি একদেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ (ডকুমেন্টারি ফিল্ম)

২. ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতির ইতিবৃত্ত (ডকুমেন্টারি ফিল্ম)

৩. নারীর মর্যাদা (ডকুমেন্টারি ফিল্ম)

৪. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান 'সভ্যতা'! (ডকুমেন্টারি ফিল্ম)

৫. দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার (ডকুমেন্টারি ফিল্ম)

৬. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা- মো'জেজার ভাষণের সিডি

৭. অন্যান্য দল না করে হেযবুত তওহীদ কেন করব? (আলোচনার ভিসিডি)

৮. The Leader of the Time (গানের অ্যালবাম-সিডি)

৯. সকল ধর্মের মর্মকথা - সবার ঊর্ধ্বে মানবতা (ডকুমেন্টারি ফিল্ম)

দৈনিক বজ্রশক্তিসহ বিভিন্ন পত্রিকায় আমাদের প্রবন্ধসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও বিষয়াদি নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্তাহিক সংকলন।